সন্দীপন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সন্দীপন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ সাহিত্য বার্ষিকী

১৯৯৩

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক ঃ
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
পলাশ বসাক
কলেজ নং ৫৯২৫
একাদশ শ্রেণী (মানবিক)

মুদ্রাকর ঃ
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে ঃ
শ্রী শীলব্রত চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

জনাব মোঃ ইরশাদুল হক সচিব, শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	ঃ	চেয়ারম্যান
প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
অধ্যাপক মোঃ ইউনুস মিয়া মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
প্রফেসর মোঃ লতিফুর রহমান চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুস সোবহান যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
জনাব মোঃ হাসিনুর রহমান সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
অধ্যাপক এ. কে. শামসুদ্দিন সিদ্দিকী পরিচালক, মেডিক্যাল এডুকেশন ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ উপ-সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
মিসেস উম্মে সালমা চিশতী সহকারী অধ্যাপক ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা।	ঃ	সদস্য
প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই অধ্যক্ষ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা।	ঃ	সদস্য-সচিব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই	অধ্যক্ষ
জনাব মোঃ শামসুল হক	উপাধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত
জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	উপাধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত (জুনিয়র শাখা)

বাংলা বিভাগ

জনাব এ.কে.এম. আব্দুল মান্নান	সহকারী অধ্যাপক
মিসেস রাহাতুন্নেছা হক	সহকারী অধ্যাপক
জনাব আব্দুর রাজ্জাক	সহকারী অধ্যাপক
মিসেস রওশন আরা বেগম	সহকারী অধ্যাপক
মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম	প্রভাষক
মিসেস জেহিন বেগম	প্রভাষক
মিস শাহানা আক্তার	প্রভাষক

ইংরেজী বিভাগ

জনাব এ.বি.এম. শহীদুল ইসলাম	প্রভাষক
জনাব ইরশাদ আহমেদ শাহীন	প্রভাষক
জনাব মোঃ মোস্তফা	প্রভাষক
মিসেস নিশাত হাসান	প্রভাষক
জনাব মোঃ নুরুন নবী	প্রভাষক
মিসেস মাহবুবা পান্না	প্রভাষক
জনাব মোঃ শিহাবউদ্দীন	প্রভাষক

গণিত বিভাগ

জনাব ফয়জুর রহমান	সহকারী অধ্যাপক
মিসেস দিলারা বেগম	প্রভাষক
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ	প্রভাষক
জনাব মোঃ মনজুরুল হক	প্রভাষক

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

জনাব এ.টি.এম. জালাল উদ্দীন	সহকারী অধ্যাপক
জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার	প্রভাষক
জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান	প্রদর্শক

রসায়নবিদ্যা বিভাগ

জনাব মোঃ আতাউল হক	সহকারী অধ্যাপক
জনাব মোঃ গোলাম মর্তুজা	সহকারী অধ্যাপক
মিসেস মাহফুজা ওয়ালী	প্রভাষক
জনাব সুলতান উদ্দীন আহমেদ	প্রভাষক
জনাব মানিক চন্দ্র ঘোষ	প্রদর্শক

জীববিদ্যা বিভাগ

জনাব নুরুল ইসলাম ভূঁইয়া	প্রভাষক
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	প্রভাষক
জনাব মোঃ সানাউল হক	প্রদর্শক

ভূগোল বিভাগ

জনাব মোঃ সুজা-উদ-দৌলা	প্রভাষক
জনাব আব্দুল মোমেন খান	প্রদর্শক

অর্থনীতি বিভাগ

জনাব প্রলয় কুমার গুহ নিয়োগী	সহকারী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

জনাব শেখ মোঃ ওমর আলী	সহযোগী অধ্যাপক
জনাব আসাইক ইউসুফজাই	সহযোগী অধ্যাপক
মিসেস উম্মে সালমা চিশ্‌তী	সহকারী অধ্যাপক
মিসেস শামীম রহমান	প্রভাষক
জনাব নজরুল ইসলাম	প্রভাষক

পরিসংখ্যান বিভাগ

জনাব মোঃ ফিরোজ খান	প্রভাষক

পৌরনীতি বিভাগ

জনাব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	প্রভাষক

যন্ত্রবিদ্যা বিভাগ

জনাব শরীফ হারুনুর রশীদ	প্রভাষক

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

জনাব খালেদুর রহমান	প্রভাষক

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

জনাব এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া	সহকারী অধ্যাপক
জনাব মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন	প্রভাষক
মওলানা লোকমান আহমদ আমীমী	মৌলভী
মওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	মৌলভী

চারু ও কারুকলা বিভাগ

জনাব কে. কে. সরকার	প্রভাষক
মিসেস মাহবুবা হাবিব	প্রভাষক

ক্রীড়া বিভাগ

জনাব মোঃ সুলতান উদ্দীন	প্রভাষক
জনাব জেড.এইচ. মাহবুব আমজাদ	সহকারী ক্রীড়া শিক্ষক
জনাব খলিলুর রহমান	সহকারী ক্রীড়া শিক্ষক
জনাব এম. এ. খালেক	সহকারী ক্রীড়া শিক্ষক
মোঃ জাকির হাসান	সংগীত ও স্কাউট শিক্ষক (খণ্ডকালীন)
জনাব শীলব্রত চৌধুরী	গ্রন্থাগারিক
ডাঃ মোঃ শাহজাহান আলী	মেডিক্যাল অফিসার

দ্বিতীয় শিফট

শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী

প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই	অধ্যক্ষ
জনাব কাজী রেজাউল ইসলাম	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলা বিভাগ	
জনাব কামরুল ইসলাম	প্রভাষক
মিসেস কামরুন নাহার খানম	প্রভাষক
ইংরেজী বিভাগ	
জনাব কে. এম. তৌহিদুর রহমান	প্রভাষক
মিসেস নুরুন্নাহার বেগম	প্রভাষক
গণিত বিভাগ	
জনাব মোহাম্মদ ফারুক আনাম	প্রভাষক
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ	
মিস সাবিনা আলম	প্রভাষক
রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ	
মিস হোসনে আরা বেগম	প্রভাষক
জীববিজ্ঞান বিভাগ	
মিসেস আসমা বেগম	প্রভাষক
ভূগোল বিভাগ	
মিস আসমা পাঠান	প্রভাষক
অর্থনীতি বিভাগ	
মিস আইরিন ফরিদা ইসলাম	প্রভাষক
ইতিহাস বিভাগ	
মিসেস মিরাতুন জাহান মেজবাউদ্দিন	প্রভাষক
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ	
মিসেস ফাতেমা জোহরা	প্রভাষক

কলেজের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম ও পদবী

প্রশাসন শাখা

১। জনাব এম. মোবারক আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২। জনাব মোঃ সিকান্দার মিয়া, সুপারিনটেনডেন্ট
৩। জনাব শেখ আজিজুর রহমান, উচ্চমান সহকারী (হিসাব শাখা)
৪। শ্রী প্রভুদাস পাল, উচ্চমান সহকারী
৫। জনাব আব্দুল বাতেন, নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক
৬। জনাব মোঃ নুরুল হুদা, নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক
৭। মিস রওশন আরা, নিম্নমান সহকারী
৮। মিসেস তাহমিনা বেগম, নিম্নমান সহকারী
৯। মিসেস সালমা আখতার জাহান, দ্বিতীয় শিফট, উচ্চমান সহকারী

হিসাব শাখা

১। জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২। জনাব মোঃ আইনুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক
৩। জনাব মিজানুর রহমান, হিসাবসহকারী, (টক্সবুক ষ্টোরে কর্মরত)
৪। জনাব সাখাওয়াত হোসেন, হিসাব সহকারী, (ষ্টুয়ার্ড হিসাবে কর্মরত)
৫। জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক
৬। জনাব মোঃ ছানাউল্লাহ্, নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক
(সহকারী ষ্টোর কিপার হিসাবে কর্মরত)

হাউস

১। জনাব বশির আহমেদ সরকার, ষ্টুয়ার্ড (কেন্দ্রীয় ষ্টোরে কর্মরত)
২। জনাব খলিলুর রহমান, ষ্টুয়ার্ড
৩। মিসেস আফিয়া খানম, মেট্রন
৪। শামছুন নাহার চৌধুরী, মেট্রন (হিসাব শাখায় কর্মরত)
৫। জনাব ইখতিয়ার উদ্দীন তালুকদার, ষ্টুয়ার্ড

চিকিৎসা বিভাগ

১। জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, ফার্মাসিস্ট
২। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ফার্মাসিস্ট

লাইব্রেরী ও টেক্সটবুক স্টোর

১। জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, ক্যাটালগার
২। জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী, টেক্সটবুক স্টুয়ার্ড
(হাউস স্টুয়ার্ড হিসাবে কর্মরত)

কেন্দ্রীয় স্টোর

১। জনাব মিজানুল হক, সহকারী স্টোর কিপার (হিসাব শাখায় কর্মরত)

গ্রাউন্ড শাখা

১। জনাব এইচ. এম. মান্নান, গ্রাউণ্ড সুপারিনটেনডেন্ট

নিরাপত্তা শাখা

১। জনাব মমতাজ উদ্দীন, কেয়ার টেকার

রক্ষণাবেক্ষণ শাখা

১। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, উপসহকারী প্রকৌশলী
২। জনাব আব্দুল মুজিব, ইলেকট্রিশিয়ান

গাড়ী চালক

১। জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, গাড়ি চালক
২। জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ, গাড়ি চালক

পৃষ্ঠপোষকতায়

প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ

সহযোগিতায়

জনাব মো: শামসুল হক, উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

কলেজ সাহিত্য বার্ষিকী কমিটি

১।	জনাব শেখ মোঃ ওমর আলী, সহযোগী অধ্যাপক	আহবায়ক
২।	জনাব রাহাতুন্নেছা হক, সহকারী অধ্যাপক	সদস্য
৩।	জনাব আব্দুর রাজ্জাক, সহকারী অধ্যাপক	সদস্য
৪।	জনাব সুজা-উদ-দৌলা, প্রভাষক	সদস্য
৫।	জনাব শরীফ হারুনুর রশিদ, প্রভাষক	সদস্য
৬।	মিসেস মাহবুবা পান্না, প্রভাষক	সদস্য
৭।	জনাব শীলব্রত চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক	সদস্য

ছাত্র সদস্যবৃন্দ

১। পলাশ বসাক, কলেজ নং ৫৯২৫, একাদশ মানবিক
২। গোলাম কিবরিয়া, কলেজ নং ৪১৭৯, দশম বিজ্ঞান
৩। কামরুল আহমেদ, কলেজ নং ৩৬৭৫, একাদশ বিজ্ঞান
৪। আবু নাসের, কলেজ নং ৫৯৬২, একাদশ মানবিক
৫। মো: জহিরউদ্দীন, কলেজ নং ৫৯২৯, একাদশ মানবিক
৬। মো: এহ্সানুজ্জামান, কলেজ নং ৫৯৩০, একাদশ মানবিক

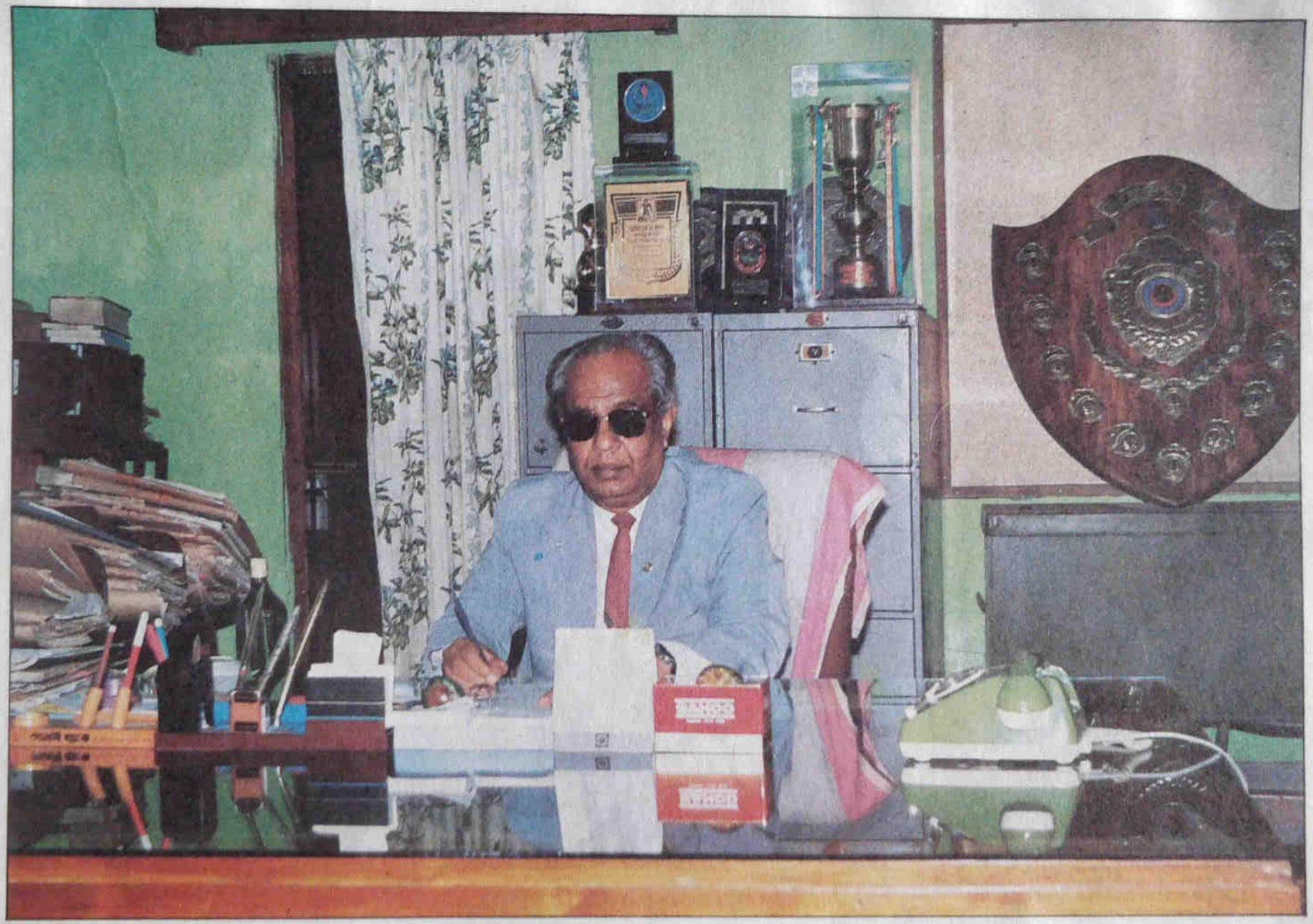

অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুল হাই

অধ্যক্ষের বাণী

ছোট্ট কুঁড়ির মধ্যে যেমন বিকশিত পুষ্পের সৌরভ ও সৌন্দর্যের ইঙ্গিত, বীজের মধ্যে যেমন মহীরুহের সম্ভাবনা তেমনি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অযুত সম্ভাবনার ধারক শিশু-কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হল সাহিত্য বার্ষিকী "সন্দীপন"।

আবেগ প্রকাশের ব্যাকুলতা কোন নির্দিষ্ট বয়সের সীমায় আবদ্ধ নয়। জন্ম-লগ্ন থেকে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের মনের আকুতি নানাভাবে বাঙময় হতে চায়। আর তাই মানুষ সৃজনশীল। এ চিরন্তন প্রবণতারই স্বাক্ষর এ কলেজের সাহিত্য বার্ষিকী "সন্দীপন"। এর ক্ষুদ্র পরিসরে এ ঐতিহ্যবাহী বিদ্যায়তনের শিশু-কিশোরেরা আপনাদের কচি মনের সৃজনশীলতার পরিচয় রেখেছে। তাদের অবুঝ মনের লাবণ্যে ভরে উঠেছে এর পাতাগুলো। এর মধ্যে অনুভূতির গভীরতা বা অভিজ্ঞতার চমক নাইবা থাকুক; তরুণ মনের সুন্দর, সুস্থ, পবিত্র উৎসারণ রয়েছে। আজকের এই কাঁচা হাতের লেখকদের মধ্যেই হয়তো রয়েছে আগামী দিনের কালজয়ী লেখক। যাদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে "সন্দীপন" তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সন্দীপনের ছোট্ট দীপ শিখাগুলো একদিন কলেজ অঙ্গনের বাইরে প্রদীপ্ত সূর্যের বর্ণচ্ছটা নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে এই আমার বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।

কলেজের নির্ধারিত কার্যক্রমের অজস্র ব্যস্ততা সত্ত্বেও যাঁদের ঐকান্তিক সহ-যোগিতা ও প্রচেষ্টায় "সন্দীপন" প্রকাশিত হয়েছে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে এ প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্য বার্ষিকী "সন্দীপন"-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

মোঃ আবদুল হাই

সম্পাদকীয়

সাহিত্য জীবন বিচ্ছিন্ন কোনো উৎকেন্দ্রিক সৃষ্টি নয়। গতিশীল মানব জীবন যখন বস্তু জগত ও বৃহত্তর জীবন ব্যবস্থার সান্নিধ্যে এসে প্রসন্নতার ভাবে আপ্লুত হয়, সাহিত্য তখনই তার আপন বৈভব নিয়ে বাণীমূর্তি লাভ করে। বস্তু জগত সাহিত্যের উপলক্ষ হলেও তার মৌল আবেদন নান্দনিক তথা সৌন্দর্যের আবেদন। সাহিত্যস্রষ্টার আপন সত্তার উপলব্ধি লাভ যদিও মহাজাগতিক বস্তুনির্ভর তবুও তার হৃদয় বৃত্তির উজ্জ্বল চিত্ররূপ তো ঘটে তার সৃষ্টি ক্ষয়-প্রজ্ঞার পথ ধরে আত্ম বিকশনের মধ্য দিয়ে। এই আত্ম বিকশনের পথ অনিঃশেষ। মানব বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্র যত প্রসারিত হচ্ছে ততই তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে জ্ঞানের নতুন পরিধি উন্মোচিত হচ্ছে। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত এ জ্ঞান সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে নতুন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কারে।

সৃষ্টির এই শাশ্বত বাসনা ও অত্যুগ্র উন্মাদনা সম্ভবতঃ জন্ম দিয়েছে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের এ মহতী প্রচেষ্টার—যার নাম সন্দীপন। এতদিন ধরে এ কলেজের যে সমস্ত স্ফুটনোন্মুখ অঙ্কুরের দল শতদল হয়ে আত্মবিকশনের অপেক্ষায় সৃষ্টির অপার বেদনায় অস্থির হয়েছিল তাদের সেই অন্তর্গূঢ় সৃষ্টির বেদনায় সুগভীর প্রশান্তি এনে দিল সন্দীপন।

কলেজ বার্ষিকীর মুখ্য স্থপতি এর ছাত্রবৃন্দ। তাই, এর ভাবগত চেতনা ও রূপগত অবয়ব তাদেরই ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, সাহিত্য যদি জীবন বৃক্ষের ফুল হয়, তবে সে ফুলের সৌরভ এ কচিকাঁচাদের কাঁচা হাতের অপরিপক্ক সৃষ্টিতে কতটুকু বিচ্ছুরিত হয়ে দিক্‌পাশ আমোদিত করতে পেরেছে সে বিচারের ভার বিদগ্ধ পাঠকের হাতে রইল। এ ব্যাপারে তাদের সামান্যতম ব্যর্থতার জন্যও আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু সাথে সাথে একথাও স্মর্তব্য যে, সে ফুল এখনও বিকশিত হয়নি—শুধুমাত্র বিকাশোন্মুখ, তার কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ আশা করা দুরাশা মাত্র।

সন্দীপন অর্থ যা সমভাবে দীপন বা আলোকিত ও উদ্দীপ্ত করে। এ তাৎপর্যপূর্ণ নামায়নের অর্থ সার্থকতা তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে যখন এ শিক্ষায়তনের মৃণালনিন্দিত ঘুমন্ত ছাত্রদের জ্ঞানপিপাসা, সর্বোপরি তাদের সৃষ্টি-প্রয়াসকে সন্দীপন সন্দীপিত ও উদ্দীপিত করতে সমর্থ হবে। অনাগত ভবিষ্যতেই শুধু নয়, বর্তমানেও এসব মুকুলের সৌরভ সকলকে মোহিত করুক, এদের সৃষ্টিশীল জীবনধর্মী সৃষ্টির ফসল সন্দীপন সমৃদ্ধ হোক—এটাই আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

আমাদের জীবনে সাহিত্যে মননচর্চায়, জীবনবোধের অন্বেষায় এবং শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার অনন্য ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য অনস্বীকার্য। একারণে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষার উপযুক্ত পরিচর্যার লক্ষ্যে এ বার্ষিকীতে একটি ইংরেজী বিভাগ সংযোজিত হয়েছে।

সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় সীমিত কলেবরের মধ্যেই এ বার্ষিকীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এ কারণে অনেক সম্ভাবনাময় লেখনীর জন্যও সন্দীপন স্থান করে দিতে পারেনি। আশা করি বারান্তরে তাদের লেখা দ্বিগুণ প্রত্যাশার সমৃদ্ধি আনবে, আনবে আনন্দ।

এ বার্ষিকী কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়—অনেকেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। এ কলেজেরই ছাত্রবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর আন্তরিক সহযোগিতা সর্বোপরি মাননীয় অধ্যক্ষের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সবার হাতে এসেছে এ সন্দীপন। সর্বশেষে এ বার্ষিকীর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কলেজের ২য় শিফ্‌টের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের মাঝে অধ্যক্ষ-ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ

কলেজ সাহিত্য বার্ষিকী কমিটির মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কেন্দ্রীয় প্রিফেক্টদের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

সূচিপত্র

ছড়া

কন্ট	১	রাশেদুল ইসলাম
কঞ্জুস বুড়ো	১	আসাদুল্লাহ আল গালিব
বুড়ো দাদু	১	আবিদ হোসেন
কালু মিয়া	১	সাজ্জাদ রহমান
আমি	১	মুঈদ হাসান
কুস্তি	২	জি. এম এ. আশিক হোসেন
টোকাই	২	ফজলে রাব্বি
আপুর বিয়ে	২	হাফিজুর রহমান
ছিনতাই	২	মোঃ নিজামউদ্দিন
পরীক্ষা	৪	মোঃ সাঈদ ইবনে ফয়েজ
মেয়েটি	৯	আশফাকুজ্জমান চৌধুরী

কবিতা

মুক্তিযুদ্ধ	৪	সাজ্জাদ রহমান
স্বাধীনতা	৯	মোঃ সাদ বিন শহীদ
এমন সুন্দর দেশ	১০	মুঈদ হাসান
তোমার জন্য	১০	আজগর আজিজ
একুশ	১০	মুনতাসির রহমান
স্বাধীনতার দান	১১	আমিনুল বারী
মশার গান	১১	তানভীর আলম রনি
আর্তি	১২	আমিমুল এহসান
কোকিল প্রেমিক	১২	সাদী আবদুল্লাহ্
মাকে	১৩	আবিদ হোসেন
মডেল কলেজে আমার পাঠ	১৩	সুলতান মাহ্মুদ সুমন
দুষ্টু মেয়ে	১৪	মোঃ ইসমাইল হোসেন
দইওয়ালা ও আমি	১৪	কাজী শাহেদ হাসান

ভাল ছাত্র	১৫	সামিউর রহমান
নতুন বছর	১৫	ইফতেখার উল আলম
গরীব ছেলেটির ঈদ	১৫	মারুফ মোস্তফা
আমার গ্রাম	১৫	শেখ শাহরিয়ার নূর
শুভ হোক চৌদ্দ'শ সাল	১৬	এ. কে. এম. সোহেল
হরতাল	১৬	নিশাত-বিন-ইসলাম
আমি তো দেখিনি বিজয়	২৪	মুহঃ জেহাদউদ্দীন
সাগর তলেই যাবো	২৭	গোলাম কিবরিয়া জুয়েল
রাতের গাঁয়	৪১	গোলাম কিবরিয়া জুয়েল
স্বাধীন দেশ	৪৮	মোজাম্মেল হোসেন
হতাশা	৪৮	রাশেদ মিনহাজ
বোধ	৫৮	জেহিন বেগম
ঢাকার মশা	৫৮	মোঃ আলমগীর আলম

গল্প

মহাশূন্যে বিপদ	৫	মারুফ আহমেদ
একটি হুকার	৭	হাসান হাবীব
পাজি ভূতের কাণ্ডকারখানা	২০	খন্দকার রাজীব হোসেন
সাগরের মুক্তা	৩৬	মোঃ জেহাদউদ্দিন
ভুতুড়ে গল্প লাশ	৪৭	মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম

ভ্রমণ কাহিনী

লেকের শহরে কয়েকদিন	১৭	শেখ খালিদ মোঃ ইফতেখার
কা'বার পথে	৪৯	লোকমান আহমদ আমীমী

প্রবন্ধ

চৌদ্দ'শ সাল	৩	রাশেদ লতিফ
বিস্মৃত নাম জলধর সেন	২১	আবু নাসের রাজীব
পারমাণিক সন্ত্রাস এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা	২৫	কামরুল আহমেদ
কম্পিউটার ভাইরাসের কথা	৪২	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান
মহাবিশ্বের কথা	৪৪	শাহনেওয়াজ খান

নাটিকা

মন্ত্রীর পদত্যাগ	৩১	মু. জেহাদউদ্দিন

কৌতুক

২৮ সংগ্রহ ঃ মোঃ আরিফুল ইসলাম; ২৮ সংগ্রহ ঃ তওফিকুর রহমান; ৩০ সংগ্রহ ঃ রাশেদুল ইসলাম; ৩০ সংগ্রহ ঃ তৌফিক মাহমুদ; ৩০ সংগ্রহ ঃ সাইফুল তারেক ফুয়াদ; ৩০ সংগ্রহ ঃ মোঃ সাঈদ ইবনে ফয়েজ

ধাঁধা

৪১ সংগ্রহ ঃ স্বনার্ভ বনিক; ৪১ সংগ্রহ ঃ হাফিজুর রহমান; ৪৬ সংগ্রহ ঃ রাফায়েল মাহবুব; ৪৬ সংগ্রহ ঃ মারুফ মোস্তফা; ৪৬ সংগ্রহ ঃ তানভীর হোসেন রাজীব; ৪৮ সংগ্রহ ঃ তানভীর সিদ্দিক; ৪৮ সংগ্রহ ঃ আলমগীর

প্রতিবেদন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ স্কাউট-কার্যক্রম ৫৯ কে. কে. সরকার; খেলাধুলা ৬২; কুদরত-ই-খুদা হাউস ৬৩; জয়নুল আবেদীন হাউস ৬৪; ফজলুল হক হাউস ৬৬; নজরুল ইসলাম হাউস ৬৭; লালন শাহ হাউস ৬৯; কলেজ সংবাদ ৭১

ENGLISH SECTION

Love and Hatred	85	A. B. Md. Shahidul Islam
Humanity	87	Md. Monirul Hoque
The Traffic Signal	87	Md. Shariful Islam
The Cloudy Sky	87	Md. Aminul Islam
My life without you	88	Mahbooba Panna
Three Boys	88	Kudrat-e-Khuda
The Little Boy Orland	88	Kazi Shahed

কষ্ট

রাশেদুল ইসলাম
কলেজ নং ৫৪৮৪
পঞ্চম শ্রেণী

মানুষের কতই না কষ্ট
জীবনটা আঁধারে নষ্ট
লেখাপড়ার নেই টাকা
চলে না জীবনের চাকা।

বুড়ো দাদু

আবিদ হোসেন
কলেজ নং ৫৫০৫
পঞ্চম শ্রেণী

বুড়ো দাদু পান খেয়ে
চিপটি ফেলেন শুধু
সময় কাটান গল্প করে
শুনতে যেন মধু।

বুড়ো দাদুর মাথায় আছে
ইয়া বড় টাক
মাঝে মাঝে বাজতে শুনি
পেটের মধ্যে ঢাক।

বুড়ো দাদুর পাশে থাকে
মগে গরম পানি,
কাশি এলেই খান শুধু
জোরে মগ টানি।

কঞ্জুস বুড়ো

আসাদুল্লাহ আল গালিব
কলেজ নং ৫১৮৯
ষষ্ঠ শ্রেণী

কঞ্জুস বুড়ো বসে গাছে
পাখিদের বলে ডেকে কাছে,
ঠুকরিয়ে যদি নিস দাড়ি
যাব না আর নাপিতের বাড়ি।

কালু মিয়া

সাজ্জাদ রহমান
কলেজ নং ৫৭৪৪
চতুর্থ শ্রেণী

কালু মিয়ার চেহারাখানি
দেখতে খুব কট্টর,
তাই না দেখে হাবু মিয়া
কেঁপে উঠে থরথর।

আমি

মুঈদ হাসান
কলেজ নং ৫৪৮৭
পঞ্চম শ্রেণী

আমার নাম বাবু
খাই শুধু সাবু
ধরতে যাই কিছু
সবাই ছুটে পিছু
এসব আমি দেখে
হেসেই মরি সুখে।

কুস্তি

জি. এম. এ. আশিক হোসেন
কলেজ নং ৫৭৩১
চতুর্থ শ্রেণী

হাবু আর গাবু
দুইজনে দুস্তি
দিন নেই রাত নেই
করে শুধু কুস্তি।

হাবু বেশ বড়সড়
গাবু হলো পিস্তি
হেরে গিয়ে হাবু বলে
উৎসাহ তো দিচ্ছি।

টোকাই

ফজলে রাব্বি
কলেজ নং ৫৫৩০
পঞ্চম শ্রেণী

টোকাই আমার নাম
নাই কো আমার ধাম
যা কিছু যখন পাই
হাপুস হুপুস খাই।
দেশের কিছু জানিনে
তাই তো নিয়ম মানিনে
আমি হলাম দুঃখী
কেউ হয়না আমার মুখী।

আপুর বিয়ে

হাফিজুর রহমান
কলেজ নং ৫৮৪৩
চতুর্থ শ্রেণী

তা তা ধিন ধিন
আপুর বিয়ের দিন
গায়ে মাখবে হলদি
বর আসবে জলদি
বরের মুখটি থালা,
গলায় ফুলের মালা
নাগরা থাকবে পায়ে
চুরি হবে তা বায়ে
কেউ না বলবে, "একি?"
অন্যরা বলবে, "সেকি?"
কেউ না মরবে হেসে
বরের কাটবে সময় কেশে।

ছিনতাই

মোঃ নিজামউদ্দিন
কলেজ নং ৫২৩৩
ষষ্ঠ শ্রেণী

পথের উপর লোকটি খাড়া
ইসরে বাবা। কি চেহারা!
দেখতে যেনো দৈত্য দানো,
কাঁচির মতো গোঁফ পাকানো।
উঁচিয়ে তার মস্ত বড় ভুড়ি,
আমার বুকে ধরলো লম্বা ছুরি।
ভয়ে আমি খাচ্ছি খাবি,
ব্যাটা বলে কই পালাবি?
জামা, জুতো, টাকা, কড়ি,
সবই নিলো তড়ি ঘড়ি।
ফুলপ্যান্টটি আমায় করে রক্ষা,
ব্যাটা দেয় আমায় জোরে ধাক্কা।

চৌদ্দ'শ সাল

রাশেদ লতিফ
কলেজ নং ৪১৫৩
অষ্টম শ্রেণী

এসো হে বৈশাখ এসো এসো। নতুন বছরের আহ্বানে এদেশের মানুষ নতুন আশায় বুক বাঁধে। ভুলে যায় অতীতের গ্লানি, পুরাতন স্মৃতি। আমাদের কাছে আবার ফিরে এসেছে ১লা বৈশাখ, নতুন বছর। এই নববর্ষে শুরু হলো ১৪০০ সাল। এই বছরই হবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বছর। আর একটি বছর পরে হবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু। আজ ১৪০০ সাল। চতুর্দশ শতাব্দীর বিদায় বছর। আমরা বাঙালীরা ১৪০০ সালকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে শতাব্দীকেও বিদায় জানাচ্ছি।

বাংলা সন চালুর পুরো কৃতিত্ব সম্রাট আকবরের। সম্রাট আকবর হিজরী সন সংস্কার করে বাংলা সন চালু করেন। মাসের নামগুলো নেয়া হয়েছে বাংলা থেকে। এটি ছিল সম্রাট আকবরের খুবই অসাধারণ একটি কাজ। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত এই বাংলা সন বাঙালী জাতি গঠনে ও সংস্কৃতি নির্মাণে যথেষ্ট অবদান রাখে। বাংলা সন বাঙালী সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কৃষি নির্ভর বাংলার জনজীবনের উপর বাংলা সন তারিখের প্রভাব বহুদিন ধরে। কৃষকরা ফসল বুনে, ফসল কাটে, বিবাহ উৎসব, পালা-পার্বণ প্রভৃতি দিন ক্ষণ ধার্য করা হয় বাংলা তারিখ অনুযায়ী।

এই সনের শুরু হয় ১লা বৈশাখে। এটা ফসল বোনার সময়। খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য সম্রাট আকবর ১লা বৈশাখকে নতুন বছরের শুরু নির্ধারণ করেছিলেন। এ নতুন দিনে ব্যবসায়ীরা পুরোনো হিসাবের খাতা ফেলে খোলেন 'হাতখাতা'। মেলা বসে গ্রামেগঞ্জে। সে সব মেলায় কত জিনিসের দোকান বসে। ছেলে-মেয়েরা বায়না ধরে তালপাতার বাঁশির জন্য। কবিগুরু ১৪০০ সাল কবিতায় তাঁর মনের আকুতি প্রকাশ করেছিলেন।

'১৪০০ সাল' কবি রবীন্দ্রনাথের এমন একটি কবিতা যা আজ আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে, কবিগুরু আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে যে বছরটিকে সামনে রেখে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবির কাছে আগাম অভিবাদন দিয়েছিলেন আমরা আজ সেই ১৪০০ সালেই দাঁড়িয়ে আছি।

১৪০০ সাল দাঁড়িয়ে আছে এক ক্রান্তিকাল হয়ে। ১৪০০ সাল দাঁড়িয়ে আছে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বছর ও পঞ্চদশ শতাব্দীর আহবানের সেতুবন্ধন হয়ে। রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতাটির জবাবে নজরুল ইসলামও '১৪০০ সাল' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা দুটি পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের যে চিত্রটি মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে সেটি আজকের দিনের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অপসৃয়মান প্রায়। ১৩০২ সালের আগুন ঝরা ফাগুন মাসে প্রকাশিত '১৪০০ সাল' কবিতাটিতে কবির যে আকুতি ছিল তাঁরই অনুরাগে ফুল বিকশিত হোক, তারই দেয়া সুরে বিহঙ্গের গান অনুরণন তুলুক, "আজি হতে শত বর্ষ পরে—।" ঠিক প্রায় দু'বছর পর অর্থাৎ ১৩০৪ সালের আষাঢ়ের বরিষণে কবি নজরুল কবিতার জবাব দিয়েছিলেন তার কবিতায়। লিখেছিলেন, "কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' পড়িয়া।" কবিগুরুকে তিনি জানাচ্ছেন আজকের যত ফুল, যত গান, যত রাগ, সবই তার অনুরাগে সিক্ত হয়ে এসেছে আমাদের দুরন্ত

যৌবনে। কবির উদ্দেশ্যে তার নিবেদন—

'তোমা হতে শতবর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি
হে কবীন্দ্র অনুরাগ ভরে।
আজি এ মাদলসা ফাগুন নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে।'

বাঙালীজাতি ১৪০০ সাল উদ্‌যাপনের মহোৎসবে দারুণভাবে আন্দোলিত ও পুলকিত। শত বেনুবীণা বাজছে আমাদের ঘরে—

তবুও পুরে না হিয়া ভরে না'ক প্রাণ,
শতবর্ষ সাঁতারিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তবগান,
মনে হয়, কবি,
আজো আছ আস্তপাট আলো করি' আমাদেরি
রবি।

১৪০০ সালকে বরণ করে নেবো আর একটি বছর হিসেবে যে বছরে শেষ হবে বাঙালীর একটি শতাব্দী। বাংলা ১৪০০ সাল। নববর্ষে আমরা আরো গর্বিত হই, আরো ইতিহাস রচনা করি যে ইতিহাস বিগত শতকের চেয়েও হবে চমকপ্রদ, একটি দেশের অভ্যুদয়ের মত আরো ঐতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ হোক বাংলাদেশ, বাঙালীজাতি ও বাংলা ভাষা।

পরীক্ষা

মোঃ সাঈদ ইবনে ফয়েজ
কলেজ নং ৫৭২৭
চতুর্থ শ্রেণী

সামনে পরীক্ষা কি যে করি
তাই নিয়ে চিন্তায় আমি মরি।
বই খুলে দেখি মেলা পড়া বাকি
ভাবি কেন দিয়েছিলাম এতো ফাঁকি?
পড়ার কথা ভাবলে মাথায় পড়ে বাজ
কি করে সামলাই এতো সব কাজ।
অবস্থা দেখে আব্বু বোঝান আমায়
চিন্তায় আমার সর্বশরীর ঘামায়।

মুক্তি যুদ্ধ

সাজ্জাদ রহমান
কলেজ নং ৫৭৪৪
চতুর্থ শ্রেণী

আমরা দেখিনি ভাষার মিছিল
দেখিনি মুক্তি যুদ্ধ,
ত্রিশ লক্ষ বীর বাঙালির রক্তে
বিশ্ববাসী হয়েছে মুগ্ধ।
মুক্তি সেনারা দেশকে করেছে মুক্ত
পরাধীনতার শিকল ভেঙে
রঙিন হলো স্বাধীনতার সূর্যটি
তাদেরই রক্তের রঙে।
নবীন আমরাও শপথ নিলাম
দেশকে রাখবো মুক্ত
প্রয়োজনে আবারও ঝরাবো আমরা
আমাদের বুকের রক্ত।

মহাশূন্যে বিপদ

মারুফ আহমেদ
কলেজ নং ৪৩৮৫
নবম শ্রেণী

দুই হাজার নয়শ বিশ সাল।

মহাশূন্য নিস্তব্ধ, নীরব, অন্ধকার।

কিন্তু সেই অন্ধকারের মাঝেও দেখা যাচ্ছে একটি গ্রহ, আরো দূরে রয়েছে অন্যান্য গ্রহ। গ্রহটির নাম আর্থ বা পৃথিবী। এই পৃথিবীতে রয়েছে সেখানকার শ্রেষ্ঠ পনেরো জন বিজ্ঞানী-দের নিয়ে গঠিত একটি টিমের বিশাল ল্যাবরেটরী। ল্যাবরেটরীটি রয়েছে ঠিক পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে, যেখান থেকে পুরো গ্রহটির সব খবরা-খবর অনায়াসে জানা যায়।

আগে পৃথিবী নামক গ্রহটিতে অনেক রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু এখন তা নেই। সমগ্র পৃথিবীই সহজ কথায় একটি রাষ্ট্র।

পৃথিবীর এই বিজ্ঞানীদের টিম লিডার হচ্ছেন আনোয়ার সাহেব। তিনি ছাড়া টিমের অন্যান্য কারও বয়সই চল্লিশ-এর উর্ধ্বে নয়। এই মুহূর্তে আনোয়ার সাহেব ল্যাবরেটরীর কন্ট্রোল রুমে কম্পিউটারের বিরাট স্ক্রীনে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। স্ক্রীনে তিনি যা দেখার জন্য তাকিয়ে রয়েছেন, সেটা গত দুই ঘন্টা ধরে দেখতে না পাওয়ায় প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন। 'স্কলাপ্টর' নামক একটি গ্রহ থেকে পৃথিবীতে তাদের টিমের পাঁচজন বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে 'লেইন-9' রকেটে দু'ঘন্টা আগে ফিরে আসার কথা। অথচ এখনও ফেরেনি। এই কারণে তিনি উদ্বিগ্ন, আরও একটি কারণ হচ্ছে এই বিশেষ কম্পিউটার স্ক্রীনে ঐ রকেটটির গতিবিধির চিত্র ফুটে ওঠার কথা, কিন্তু তারও কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

রকেটটি যদি এখনও মহাশূন্যে থাকে, তাহলে হিসাব অনুযায়ী রকেটের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবার কথা, আর জ্বালানি শেষ হলেই... আর ভাবতে চাইলেন না আনোয়ার সাহেব।

'স্যার আমরা কি অন্য রকেট নিয়ে মহা-শূন্যে খোঁজ নিতে যাব?'

রবার্টের কথায় ফিরে তাকালেন আনোয়ার সাহেব। বললেন, 'হ্যাঁ যাওয়া দরকার। স্পেস্-শীপ 'কভার—৪' রেডি করো এবং জাহিদ ও জর্জকে তৈরী হতে বলো। এখনই রওনা হব।'

'ও-কে স্যার।' বলে চলে গেল টিমের আরেক তরুণ বিজ্ঞানী আশফাক আহমেদ।

স্পেস্শীপ 'কভার—৪'-এ করে বিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হলেন আনোয়ার সাহেব। সঙ্গে দুই তরুণ বিজ্ঞানী জাহিদ ও জর্জ।

'ভালভাবে দেখো জর্জ, রাডারে কিছু ধরা পড়ছে কিনা।' আনোয়ার সাহেব বললেন।

'না স্যার, কিছুই ধরা পড়ছে না। সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। আগে তো কখনও এ ধরনের কাণ্ড ঘটেনি, 'লেইন—9'-এর নেতৃত্বে রয়েছে হাবিব, ও তো যে-কোন বিপদে ঠাণ্ডা মাথায় সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আজ এরকম হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না, কেমন যেন সবকিছু গোলমাল লাগছে।' জর্জ বললো।

'ঠিক আছে তুমি খেয়াল করো, কোন কিছু ধরা পড়লেই বলবে আমাকে।'

'ইয়েস স্যার'। জবাব দিয়ে স্ক্রীনে চোখ ফেরালো জর্জ।

স্পেস্শীপের কন্ট্রোলের দায়িত্বে রয়েছেন আনোয়ার সাহেব নিজেই, তাকে সহযোগিতা করছে জাহিদ। আর জর্জ রয়েছে রাডার স্ক্রীনে 'লেইন—9'-এর হদিস খোঁজার কাজে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুরো এলাকাটা চষে ফেললেন আনোয়ার সাহেব। কিন্তু নিখোঁজ রকেটটির কোন চিহ্নই কোথাও নেই।

'স্যার', হঠাৎ বললো জাহিদ। কথা খুবই কম বলে সে। এটাই তার স্বভাব।

'বলো'।

'আমাদের হিসাব অনুযায়ী জ্বালানি শেষ হবার পর 'লেইন—9-এর যে স্থানে আটকে থাকার কথা, সেখানে কিন্তু নেই। তার মানে তাদের জ্বালানি শেষ হয়নি। আর হলেও হাবিব হয়তো কোন বিকল্প ব্যবস্থা করে ফেলেছে, যার ফলে রকেটটি নিশ্চয়ই থেমে নেই।'

'রাইট। তবে যোগাযোগের চেষ্টা তো করা হয়েছে। কিন্তু ওদের কাছ থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। তার মানে কোন যন্ত্রপাতি হয়তো বিকল হয়ে গিয়েছে।' আনোয়ার সাহেব বললেন।

'আমারো তাই মনে হচ্ছে স্যার। তবে এতক্ষণে যদি ওরা সুস্থ ও অক্ষত থাকে, তাহলে হাবিব নিশ্চয়ই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে, তা সে যেভাবেই হোক না কেন আর পৃথিবীতে যোগাযোগ করলেই আমরা তা জানতে পারবো। তখন একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' জাহিদ বললো।

'স্যার!' আচমকা চিৎকার করে উঠলো জর্জ, 'স্যার, 'লেইন—9'-এর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, খুবই কাছে আছে ওটা।'

'গতিবেগ কত?' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আনোয়ার সাহেব।

'ঘন্টায় প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল।'

'কোনদিকে এগোচ্ছে?'

'সোজা আমাদের দিকে আসছে। দুঃসংবাদ আছে স্যার।'

'কি দুঃসংবাদ? জল্‌দি বলো।' ঘামছেন আনোয়ার সাহেব।

'দুঃসংবাদটা হচ্ছে, লেইন—9 নিয়ন্ত্রণহীন এবং আমরা যে পজিশনে আছি, তাতে সংঘর্ষ হবেই এবং তা কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'হোয়াট!' চোখ কপালে উঠে গেছে আনোয়ার সাহেবের, 'দ্রুত স্পীড বাড়াও জাহিদ, আমাদের স্পেস্‌শীপকে বাঁ দিকে এ্যাঙ্গেলে নিয়ে যেতে হবে।'

'স্পীড বাড়ানো সম্ভব নয় স্যার।' জাহিদ বললো। উত্তেজনায় গলার স্বর কাঁপছে তার।

'কি বলছো তুমি?'

'জ্বী স্যার, ঠিকই বলছি, আমাদের জ্বালানি প্রায় শেষ, এ্যাঙ্গেলে নিতে প্রচুর সময় লাগবে, অত সময় আমাদের হাতে নেই।'

'মাই গড্। তাহলে স্পেস্‌শীপের চারপাশে এখনই 'সেফটি শীল্ড' দিয়ে দাও।'

'সেটাও সম্ভব নয় স্যার। এতক্ষণ মহা-শূন্যে বিচরণ করার ফলে পাওয়ার ক্ষয় হয়ে শেষ প্রায়, শীল্ড দেয়ার মত যথেষ্ট পাওয়ার নেই।'

'স্যার, জলদি কিছু করতে হবে, আর চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে পজিশন পরিবর্তন করতে না পারলে সংঘর্ষ ঘটবে।' আতঙ্কিত জর্জ চেঁচিয়ে বললো।

'জাহিদ, শেষ চেষ্টা করে দেখি, যতটুকু স্পীড বাড়ানো যায়, বাড়িয়ে এ্যাঙ্গেলে নিতে থাকো, দ্রুত।' বলে নিজেও হাত দিলেন স্পেস্‌শীপের কন্ট্রোল স্টিয়ারিং।

'বিশ সেকেণ্ড সময় আছে স্যার, আর একটু সরতে পারলেই এ যাত্রায় রক্ষা পাবো।' স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো জর্জ।

রীতিমতো ঘেমে নেয়ে উঠেছেন আনোয়ার সাহেব আর জাহিদ। ঠোঁট কামড়ে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছেন আনোয়ার সাহেব।

হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো স্পেস্‌শীপের বহিরাবরণে, ঝাঁকির চোটে তাল সামলাতে না পেরে সীট থেকে পড়ে গেলেন তিনজনই। ভীষণভাবে ঠুকে গেল তিনজনের মাথা—শীগের স্টীলের দেহের সঙ্গে। জ্ঞান হারালো তিনজনই।

অকল্পনীয় আওয়াজে বিস্ফোরণ ঘটলো যান দু'টোর মধ্যকার সংঘর্ষের ফলে। নিকষ কালো অন্ধকার মহাশূন্যে যেন হাজার পাওয়া-রের বাল্ব জ্বলে উঠলো।

তারপর হঠাৎই সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কোন কিছুরই কোন চিহ্ন রইলো না।

মহাশূন্য আগের মতই নিস্তব্ধ, নীরব, অন্ধকার।

একটি হকার

হাসান হাবীব
কলেজ নং ৪৩৬৮
নবম বিজ্ঞান

'পেপার, পেপার।' চিৎকার করে উঠলো হকারটি। কতই বা আর বয়স হবে ছেলেটির —দশ বা এগার; কিন্তু পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটেনি স্বাভাবিক ভাবে। হাফ প্যান্টের উপর ছেঁড়া গেঞ্জী পরেছে। চুলে যে কতদিন তেল দেয়া হয়নি, কে জানে? সারা দেহে ধূলোর হালকা আবরণ পড়েছে। বাঁ বগলের নিচে খবরের কাগজের বান্ডিল; গ্রামের পাঠশালায় যে ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বই-খাতা নিয়ে যায়। ডান হাতের মুঠিতেও খবরের কাগজ ধরে আছে ছেলেটি। ছোট ছোট পা ফেলে দৌড়ে যাচ্ছে।

ছেলেটিকে ডাকলো চন্দন। ডাকতেই দৌড়ে এলো হকারটি। চন্দন প্রশ্ন করলো, কি কি আছে?

'ইনকিলাব, জনতা, ইত্তেফাক সবই আছে।' জবাব দিলো ক্ষুদে বিক্রেতা।

'উন্মাদ নেই?'

'না।' অপারগতার সুর হকারের কণ্ঠে।

'তাহলে থাক।'

'কার্টুন লইবেন?' আচমকা প্রশ্ন করলো বালকটি।

'আছে?' উৎসাহিত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলো চন্দন।

'আছে।' আশাভরা দৃষ্টিতে চন্দনের পানে চেয়ে উত্তর দিলো ছেলেটি। চোখে সমুদ্রের গভীরতা।

'দে।'

'এই লন স্যার।' কাগজের বান্ডিল থেকে কার্টুন পত্রিকা বের করে চন্দনের দিকে বাড়িয়ে ধরলো হকারটি। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে ধরে, চন্দন শুধালো, 'তোর নাম কি?'

'কেন্?' সতর্ক গলায় প্রশ্ন করলো বালকটি টাকা নিতে নিতে।

'এমনি।'

'আমানুল্লাহ।' কি যেন ভেবে বললো হকারটি।

'লেখাপড়া করেছিস?'

'তিন ক্লাস পড়ছি। তারপর বাপ মইরা গেল, আরেকটা বিয়া বইলো মায়, পড়ালেখা আর হইলো না।

'আবার শুরু করবি?

'না।' এমনভাবে কথাটা বললো আমানুল্লাহ, যেন পড়ালেখা করার মতো খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না।

'কেন?'

'ট্যাকা পামু কই?'

'আমি দেবো।'

চন্দনের কথা শুনে হেসে ফেললো কিশোর হকার। দীর্ঘ এক মিনিট পর থামলো সে। ওর নির্ভেজাল হাসি দেখে কেন জানি চন্দনের হিংসে হচ্ছে। কথা বললো বালক, 'পাগল।'

'আমি কেন পাগল হবো?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো চন্দন। 'আমাকে কি দেখে পাগল মনে হচ্ছে?'

'পুরান পাগলে ভাত পায় না, নতুন পাগলের আমদানী।'

'বাড়ী কোথায়?' কথার মোড় ঘোরালো চন্দন।

'যাইবেন নি?' সন্দেহ ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ছেলেটি।

'নিয়ে যাবি?'

'কখন যাইবেন, অহন?

'কতদূরে?'

'কাছেই, হাইটা যাইতে দশ মিনিট লাগে।'

'তাহলে যাবো।'

'কিন্তু অহন তো নিতে পারুম না।'

'কেন?'

'পেপার বেচতে হইবো তো। নইলে বাড়ীতে কি লইয়া যামু? মায় পিটাইবো টাকা লইয়া না গেলে।'

ছেলেটার জন্যে দুঃখ হলো চন্দনের। বললো, 'তাহলে কবে নিবি?'

'কাইলকের পরের দিন এইখানে থাইকেন, আমি আইসা লইয়া যামু।'

'ঠিক আছে।'

'তাইলে আমি অহন যাই।'

পকেট থেকে আরেকটা দশ টাকার নোট বার করে আমানুল্লাহর দিকে এগিয়ে দিলো চন্দন। 'নে রাখ্।'

'নিমু না।'

'কেন?'

'আমি ভিক্ষা করি না।'

'আমি তো তোকে ভিক্ষা হিসেবে দিচ্ছি না—কিছু কিনে খাস্।'

'আপনে একটা পেপার নিলে আমি লইতে পারি।'

'ঠিক আছে দে।' সায় জানালো চন্দন।

একটা বিচিত্রা বের করে দিলো আমানুল্লাহ। পত্রিকাটি নিয়ে চন্দন বললো, 'তোর একটা সাক্ষাৎকার নিবো।' চন্দন কিশোরদের একটি মাসিক পত্রিকার কিশোর সাংবাদিক। 'তোর ছবিও তুলবো। ঐ দিন তৈরী থাকিস।'

'আপনে সাংবাদিক?' বিস্মিত দৃষ্টি বালকের।

'হ্যাঁ।' মুচকি হেসে উত্তর দিলো চন্দন।

'কোন পত্রিকার?'

'কিশোর তারকালোকের নাম শুনেছিস?' পাল্টা প্রশ্ন করলো চন্দন।

'শুনেছি।'

'আমি ঐ পত্রিকার কিশোর সাংবাদিক।'

'মিছা কথা কইয়েন না।'

'সত্যি কথাই বললাম।' একটু দম নিলো চন্দন। বললো, 'তৈরি থাকিস কিন্তু।'

'ঠিক আছে।' এক সেকেণ্ড বিরতিতে আবার বললো আমানুল্লাহ, 'ছাপা হইলে আমারে দেখাইয়েন।'

'অবশ্যই।' কি যেন চিন্তা করলো চন্দন। 'হেডিং হবে একটি হকার।'

'দারুন হইবো তাইলে।' খুশীর আমেজ হকারের কণ্ঠে।

ওর খুশী দেখে ভালো লাগলো চন্দনের। মৃদু হাসি উপহার দিলো।

দু'দিন পর।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চন্দন দেখলো দশটা পাঁচ বাজে। অথচ এখনও আমানুল্লাহর আসার কোন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে চন্দনের। ওর দিকে যতবারই চেয়েছে, ততবারই ওর মনে হয়েছে, মানুষ বড় নিষ্ঠুর। অতটুকুন একটা বালক আর তাকেই কিনা ছুটতে হচ্ছে জীবিকার জন্যে; যার কিনা আজ স্কুলে বই-খাতা নিয়ে ছোটার কথা।

মনের পর্দায় চন্দন স্পষ্ট দেখতে পেল,—আমানুল্লাহ পেপার নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, 'পেপার' পেপার।'

চন্দন নিজেকেই শুধালো, 'কতো হকারই তো রয়েছে এ দেশে, কিন্তু ক'জন আমানুল্লাহর খবরই বা আমরা রাখি? অথচ সেই সব হকাররাই বিলি করছে নিত্য নতুন খবর প্রতিদিন সবার কাছে।'

অন্তর জগৎ থেকে বহির্জগতে ফিরে এলো চন্দন। আবার ঘড়ি দেখলো। আমানুল্লাহ কথা দিয়েছিলো পৌনে দশটার দিকে এখানে অপেক্ষা করবে।

'পেপার, পেপার।'

চকিতে ফিরে তাকালো চন্দন চিৎকারটা লক্ষ্য করে। কিন্তু না, আমানুল্লাহ নয়, অন্য

কলেজের ২য় শিফ্‌ট উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার

কলেজের ২য় শিফ্‌ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব জনাব মোঃ ইরশাদুল হক

৩২তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে সালাম গ্রহণ করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুল হাই

৩২তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

আরেকটি ক্ষুদে হকার। ছেলেটিকে ডাকতেই চন্দনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কি নিবেন?' জানতে চাইলো হকারটি। 'ইত্তেফাক, জনতা, তারকালোক, বিচিত্রা সবই আছে।'

'কার্টুন নাই?'

'না।' হতাশ গলায় অপারগতা জানালো বালকটি।

'উন্মাদ আছে?'

'আছে।' উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কিশোরটি। 'দে।'

উন্মাদ বের করে বাড়িয়ে ধরলো ছেলেটি। পত্রিকাটি নিতে নিতে চন্দন জানতে চাইলো, 'আমানুল্লাহকে চিনিস?'

'কোন আমানুল্লাহ?' পাল্টা প্রশ্ন করলো হকারটি।

'তোর মতোই দেখতে। ছোটখাটো। পেপার বিক্রি করে।'

কি যেন চিন্তা করলো বালকটি। একটি পত্রিকা বের করে, মেলে ধরে কি যেন দেখলো। তারপর এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এই ছেলেটার কথা কইতাছেন?'

ছেলেটির নির্দেশিত ছবির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম আমানুল্লাহরই ছবি; আর তখনই দৃষ্টি পড়লো হেডিংটার দিকে, "ঘাতক বাসের তলায় একটি হকার।"

তখনই চন্দন শুনতে পেল, কে যেন ওর হৃদয়ের অতল গহ্বর থেকে বলে উঠলো, 'যে ছেলেটি প্রতিদিন নতুন নতুন হেডিংয়ের খবর নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছতো, কে জানতো সেই একদিন খবরের হেডিং হবে?'

স্বাধীনতা

মোঃ সাদ বিন শহীদ
কলেজ নং ৫৫৩৫
চতুর্থ শ্রেণী

আমাদের স্বাধীনতার পরিচয় হল
লাল সবুজের পতাকা
স্বাধীনতা তুমি দিয়েছ মোদের
অখণ্ড দেশ মাতৃকা।
পাকিস্তানী হানাদাররা লুটেছিল
মোদের ঘর বাড়ি
সুযোগ সুবিধা আর অধিকার
সবই নিয়েছিল কাড়ি।
তাই ত লক্ষ মানুষ রক্ত দিল
দিল তাদের তাজা প্রাণ
আজকে আমাদের দিতে হবে
তাদের ত্যাগের প্রতিদান।
লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে
পেলাম সে স্বধীনতা,
শক্তি দিয়ে, কর্ম দিয়ে রাখব
মোরা প্রাণের স্বাধীনতা॥

মেয়েটি

আশফাকুজ্জমান চৌধুরী
কলেজ নং ৫৮৩১
চতুর্থ শ্রেণী

মেয়েটির নাম রুনা
বুদ্ধিতে সে ঝুনা;
লেখাপড়া করে না
ধরে শুধু বায়না
ভিজে শুধু বৃষ্টিতে
নুন খায় মিষ্টিতে।

এমন সুন্দর দেশ

মুঈদ হাসান
কলেজ নং ৫৪৮৭
পঞ্চম শ্রেণী

এমন সুন্দর একটি দেশ
নামটি তার বাংলাদেশ
সবুজ ঘাসের পরেছে রেশ
দেশটি হলো বাংলাদেশ
দশ দিকেতে মিঠা সুরের রেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

কত নদী নালায় ভরা
হাওর, বাওর, বিলে
মনের সুখে মাঝি মারে
কতই না মাছ ঝিলে।

ক্ষেতের বুকে চাষী ফলায়
সোনার রঙের ধান
এমন দেশেতে বইবে একদিন
অনেক সুখের বান।

একুশ

মুনতাসির রহমান
কলেজ নং ৪৬৮৯
অষ্টম শ্রেণী

একুশ আসে বারে বারে
প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে।
রফিক, জব্বার অকাতরে
প্রাণ দিল এ ভাষার তরে।
তাদেরই আজ স্মরণ করি।
পুষ্প দিয়ে মিনার গড়ি।
ফুলে ফুলে বরণ করি
খোদার কাছে প্রার্থনা আজ
"এ ভাষার মান রক্ষা করি।"

তোমার জন্য

আজগর আজিজ
কলেজ নং ৩১৮৪
একাদশ বিজ্ঞান

তোমার জন্য কোন কবিতা লিখিনি
ভিন্ন চোখে তোমায় দেখতে শিখিনি
দেখেছি শুধু নানা জনের মতে
ধিক্কৃত বা প্রসংশিত হতে।
তোমার গর্বে উঠেছে বুক ভরে,
আবার তীব্র ঘৃণাও পড়েছে ঝরে।
কিংবা কখনও তোমার পরাজয়ে
দুঃখ ভর করেছে এই হৃদয়ে।
আড্ডায় বসে পক্ষ নিয়ে তোমার
যুক্তি-তর্কে সময় করেছি পার।
বিরুদ্ধাচরণ করেছি কখনও আমি
করেছি কত দুষ্টুমী বাঁদরামী।
কিন্তু, যেদিন আমি বুঝতে শিখি
আমার মতোই তুমি 'বন্দী পাখি'।
চলছো তুমিও হয়ে নিয়মের দাস।
যদিও শুনিনি ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস,
তবুও বুঝে নিয়েছি তোমার ব্যথা,
তোমার বুকের জমে থাকা সব কথা।
তাইতো তুমি ভালবাসা হয়ে
জড়িয়ে রয়েছো আমার হৃদয়ে।
প্রিয় কলেজ তোমার নামখানি
তোমার কাছে এক আসচর্য বাণী।
সারাজীবন রাখবো তোমায় মনে
মনের কথা তাই লিখি 'সন্দীপনে'॥

স্বাধীনতার দান

আমিনুল বারী (আল-আমিন)
কলেজ নং ৩৭১৫
একাদশ বিজ্ঞান

আমি আমার দাদার মুখে শুনেছি,
পাক-ভারতের স্বাধীনতার কথা।
আমি আমার বাবার মুখে শুনেছি,
ভাষা আন্দোলনের কথা।
আমি আমার ভাইয়ের মুখে শুনেছি
বাংলার স্বাধীনতার কথা।
আর আজ আমি শোনাব,
আমার ক্ষুধার কথা।
ভাতের অভাবে আমার সর্বাঙ্গ এখন জ্বলছে।
আমি আমার পূর্ব পুরুষের মত কারও
স্বাধীনতার কথা বলি না;
সাম্যের কথা বলি না;
ঐক্যের কথা বলি না।
আজ আমি শুধু আমার ক্ষুধার কথা বলি
ক্ষুধার জ্বালায় আমার সমস্ত শরীর,
দুর্বল, ভগ্ন, নিস্তেজ।
বসন্তের হাওয়া আমার মনে এখন
মধুর বীণার ঝংকার তোলে না।
আমার জীর্ণ কাপড়খানি,
গ্রীষ্মের রোদ ঢুকতে আর বাধা
দেয় না।
আমার ভাঙ্গা কুটির খানি,
বৃষ্টির বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করে না।
সেখানে এখন বৃষ্টি-পানির অবাধ প্রবেশ।
আমার পূর্ব পুরুষে রাতে,
আমার মুক্তির জন্য;
আমার শান্তির জন্য;
প্রাণ দিয়েছিলেন।
এই কি আমার মুক্তি? এই কি আমার শান্তি
এ প্রশ্নের জবাব আমি চা-ই-চাই॥

মশার গান

তানভীর আলম রনি
কলেজ নং ৩৯৪৫
দশম বিজ্ঞান

চপল পাখায় কেবল ধাই
কেবল গাই মশার গান,
রক্ত মোর সকল গায়ে
রক্ত নেশায় বিভোর প্রাণ।
মানবদেহের মাংস-পর
চরণ থুই হুল ফুঁটাই,
গভীর রাতে সবাই ঘুম
মজা করে রক্ত খাই।
সন্ধ্যাবেলায় শান্তি নাই
মানুষ মোরে মারে চড়,
উড়ে যাই দূরে যাই
মানুষ বলে, শিঘ্রী মর।
মরটিন হাতে মানুষ সব
ভয় দেখায়, চোখ পাকায়
শঙ্কা নাই, রক্ত খাই
মরটিনেতে ভেজাল হায়।
চামড়া মোর ডোরাকাটা
ছয়টি পা আর একটি হুল,
চোখে মোর চশমা আটা
দেখতে শত্রু করিনা ভুল।
কোন্ পাড়ার পচা ডোবায়
জন্ম মোর মনে নাই,
জন্ম থেকে রক্ত পাগল
সুযোগ পেলেই রক্ত খাই।
আমার ভয়ে মানুষ সব
চিঠি লেখে পত্রিকায়,
মারতে মশা দাগায় কামান
তাতে এমন ভয় না পাই।
বাড়ির পাশের ঝোপগুলোয়
লুকিয়ে থাকি সারাদিন
রাত্রি বেলা তৃষ্ণা পায়
মানবদেহে ফুটাই পিন।
চপল পাখায় কেবল ধাই
জানি না কখন মরব হায়।
তবু মোরা রক্ত খাই
তাতেই মোরা শান্তি পাই।

আর্তি

আমিমুল এহসান
কলেজ নং ৪৪০১
সপ্তম শ্রেণী

তখন ঘড়িতে রাত বারোটা, আমাদের কারো
চোখে ঘুম নেই
ভাবনায় অস্থির মা—এখনো সে ফিরে এলো না।
আমার মনেও অজানা ভয়ের জুজু বুড়ি, ক্রমেই
মেলছে তার ডানা,
বাবা, আমার বাবা এখনো তো ফিরে এলো না।
অফিসে কাজের বড় চাপ, তাই বাবা পারেনি
ফিরতে।
অথবা পথের কোন বাঘ নিমেষে করেছে গ্রাস
তাঁকে।
ঠিক ভোর পাঁচটায়, কড়া নড়ে সদর দরজায়,
তন্দ্রার মোহজাল ছিঁড়ে জেগে উঠি আমি আর মা
একদল মানুষের কাঁধে বাবার রক্তাক্ত লাশ
আহা
বাবা—আমার স্নেহের বড় আশ্রয়,
দুখিনী, সরল প্রিয় মারও বাবা ছাড়া নেই
আশ্রয়।
প্রাণের বদল মূল্য বুঝি কয়েকটি টাকা আর
ঘড়ি।
আইন আর বিচার কি শুধু কাগজে কথার
ফুলঝুরি?
লোভী এই সমাজের কাছে আমাদের একটাই
দাবী
বাবাকে ফেরত দাও, দাও আনন্দলোকের সেই
চাবি।

কোকিল প্রেমিক

সাদী আবদুল্লাহ
কলেজ নং ৫৫১৯
পঞ্চম শ্রেণী

কোকিল ডাকে কুহু কুহু
গাছের ডালে লুকিয়ে
কোকিল প্রেমিক তাকে খোঁজে
হাত তুলে উঁচিয়ে।

কেউ বলে ঐ যে কোকিল
তোমরা কি কেউ দেখনা?
অন্য বনে উড়ে তো গেলো
কথা কিন্তু মিছে না।

অন্য গাছে গিয়ে কোকিল
আবার ডাকে কুহু কুহু
কোকিল প্রেমিক কোকিল দেখার
চেষ্টা করে তবু বহু।

গানের সাথে কোকিল দেখা
কোকিল প্রেমিক চায়
তাই না সে চেষ্টা চালায়
আবারও কোকিল ধায়।

মাকে

আবিদ হোসেন
কলেজ নং ৫৫০৫
পঞ্চম শ্রেণী

সেদিন তোমার চিঠি পেলাম
চিঠির মাঝে শুধু দেখলাম,
কান্নাভরা তোমার একটি মুখ
বাজলো মনে আমার ভীষণ দুখ।
চিন্তা তোমার কত শত
আছি নাকি ভালো মতো,
খানায়-পিনায় ভরছে নাকি পেট
বন্ধু সাথে পাকাই নাতো জোট?

হঠাৎ আমার চোখের 'পরে
খুলে গেল বদ্ধ মনের দোর
ভাঙলো আমার ভীষণ ঘোর
দেখবে এবার আলোর ভোর।

মাগো, তুমি আর কেঁদো না
ঠিকই আমি ভালো হবো
সব কাজেতে ভাল হয়ে
তোমার মনের মতো রব।

মডেল কলেজে আমার পাঠ

সুলতান মাহ্‌মুদ সুমন
কলেজ নং S-১০১
অষ্টম শ্রেণী

এই কলেজে পড়ি
ভবিষ্যতের জীবনটাকে
ফুলের মতো গড়ি।
ভাইয়ের মতো ছাত্র মোদের
পিতৃতুল্য স্যার,
মুখের শাসন, বুকের আদর
পড়ান চমৎকার।
নয়তো শুধু পড়াশুনা
জানার অনেক আছে,
নামাজ, রোজা, খেলাধুলা
শিখি তাঁদের কাছে।
গর্ব মোদের, দর্প মোদের
খর্ব হবার নয়।
তাইতো মোরা বেঁচে আছি
সব খানেতে জয়
আমার বিদ্যাপিঠের নাম
কার না আছে জানা,
হাজার ছেলে ভর্তি হতে,
এইখানে দেয় হানা।

দুষ্টু মেয়ে

মোঃ ইসমাইল হোসেন
কলেজ নং ৪২১০
দশম বিজ্ঞান

এক যে ছিল দুষ্টু মেয়ে
প্রজাপতির মত,
এদিক ওদিক নেচে বেড়ায়
খেলায় অবিরত।

কাজ-কর্ম লেখাপড়া
কিছুই করে নাকো,
বল্‌লে কিছু হাসিতে তার
মুখটি ভরে নাকো।

পড়ার সময় হলে পরে
কোথাও চলে যায়,
সারা পাড়া ঘুরে দেখে
কোথায় খেলা পায়।

সকল খেলা সাঙ্গ করে
সবাই দিয়ে ফাঁকি,
পালিয়ে যাবে একদিন সে
দুষ্টু চপল পাখি॥

দইওয়ালা ও আমি

কাজী শাহেদ হাসান
কলেজ নং ৫১৯৭
ষষ্ঠ শ্রেণী

দইওয়ালা, ঐ দইওয়ালা
কোথায় তুমি যাও?
যখন আমি ডাকি তোমায়
ফিরে নাহি চাও।

তুমি থাক পথে পথে
আমি থাকি অন্য কাজে
দুইজনের-ই আছে মাঝে
তফাৎ অনেক সাজে।

তোমার বাড়ি নিতাইপুর
আমার বাড়ি কাশিমপুর,
হোক না তা অনেক দূর
মোদের বুকে একই সুর।

জন্ম মোদের একই দেশে
থাকবো মোরা মিলেমিশে
করবো সেবা দেশের মোরা
সুনাম হবে জগৎ জোড়া।

ভালছাত্র

সামিউর রহমান
কলেজ নং S-৯
তৃতীয় শ্রেণী

দিয়েছি ভাল পরীক্ষা, মন্দ সেতো হয়নি
নম্বর পেয়েছি কত, শুনে কেউ হাসেনি।
ইতিহাসে পেয়েছি বার, বাংলাতে ছয়,
দুটি আমার মাতৃভাষা, তাই করিনে ভয়।
ইংরেজীটা বিদেশী তাই
পড়তে কষ্ট হয়
ইংরেজীতে খুব সম্ভব
পাব আমি নয়।
অংকে আমি বেজায় পাকা
পেয়েছি একটা গোল,
অংক খাতায় লিখেছিলাম
শুধুই আমার রোল।

গরীব ছেলেটির ঈদ

মারুফ মোস্তফা
কলেজ নং S-৪
তৃতীয় শ্রেণী

ঈদের দিনে সবাই যখন
খুশীতে আত্মহারা.
ছেলেটি তখন মাকে হারিয়ে
সুজনহীন, সর্বহারা।

পেটটি ভরে পায়না খেতে
ক্ষুধার জ্বালায় থাকে,
কে জানত যে ঈদের দিনে
হারাতে হবে মা'কে।

নতুন বছর

ইফতেখার উল আলম
কলেজ নং S-২৫৩
অষ্টম শ্রেণী

নতুন বছর নতুন স্বাদে
এলো সবার ঘরে,
পুরোন বছর বিদায় নিলো
একটি বছর পরে।
যে দিন গত হয়ে গেছে
কি লাভ ভেবে তাকে,
নতুন করে স্বপ্ন আঁকি
স্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে।
সুখে-দুখে যেমনি ছিলাম
বলবো ছিলাম ভালো,
সামনে চলার পথে ফুটুক
আশার রঙিন আলো।

আমার গ্রাম

শেখ শাহরিয়ার নূর
কলেজ নং S-২৬৯
তৃতীয় শ্রেণী

বড়ই মজার গ্রামটি আমার
সকল ঋতুর কালে,
ফল ফুল আর ফসল ভরা
নৌকা চলে পালে।
সেইখানেতে বন্ধু আমার
গলায় গলায় মিল,
নেইকো কোনো ঝগড়া ঝাটি
সবার খুশির দিল।
সারাটা দিন খেলি ধুলি
পড়ার সময় পড়ি,
ভোর বেলাতে ঘুম ভাঙ্গে মোর
সোনার সমাজ গড়ি।

শুভ হোক চৌদ্দশ সাল

এ. কে. এম সোহেল
কলেজ নং S-৫৩
তৃতীয় শ্রেণী

নিরানব্বই বছরে ঘটেছে পৃথিবীতে কতকিছু
কেউবা ছুটিছে আলোর পেছনে, কেউ
আঁধারের পিছু
কত যুদ্ধের দামামা বেজেছে আকাশ ছেয়েছে
ধোঁয়ায়
পাশাপাশি এ পৃথিবী হেসেছে ফুলের মিষ্টি
ছোঁয়ায়

তছনছ করে দিলো পৃথিবীকে
কতনা ঘূর্ণিঝড়
ঝড়ের পরেই আকাশে উড়েছে
শত শত কবুতর,
কত মারামারি, কত কাটাকাটি
হলো কত খুনাখুনি,
তার মধ্যেও ন্যায়, সত্যের
কণ্ঠ ধ্বনি শুনি.
হিংস্র বাঘেরা গর্জে উঠেছে
সাপেরা তুলেছে ফণা,
পাশাপাশি নদী, পাখিরা গেয়েছে
ঝরেছে শিশির কণা।
ধ্বংস এসে পৃথিবী গুঁড়িয়ে
দিয়ে গেছে যতবার,
সৃষ্টির গান আকাশে বাতাসে
শোনা গেছে ততবার।
মন্দরা ছিলো, মন্দরা আছে
থাকবেও চিরকাল
তবুও ভালোর ছোয়া লেগে শুভ
হোক চৌদ্দশ সাল।

হরতাল

নিশাত-বিন-ইসলাম
কলেজ নং S-২২৫
সপ্তম শ্রেণী

হরতাল হরতাল
চারদিকে করতাল,
যানবাহন কিছু নাই
কেমন করে স্কুলে যাই?
স্কুল কি খুলবে?
ক্লাস কি বসবে?
টিচার কি আসবে?
না গেলে তো বকবে।
সে কি চিন্তা।
লাগে শুধু ধান্দা
বাসা থেকে বের হই
পায়ে হেটে যাব কই?
রাস্তায় শ্লোগান,
তালে তালে চলে গান
দাবী হবে মানতে
গদি হবে ছাড়তে,
মিছিলটার কাছে যাই
কয়েকটি ঢিল খাই
ইয়াবড় এক ঢিল লেগে
মাথা গেল ফুলে,
সব গেল পালিয়ে
আমি গেলাম স্কুলে।

অফিস কর্মচারীবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

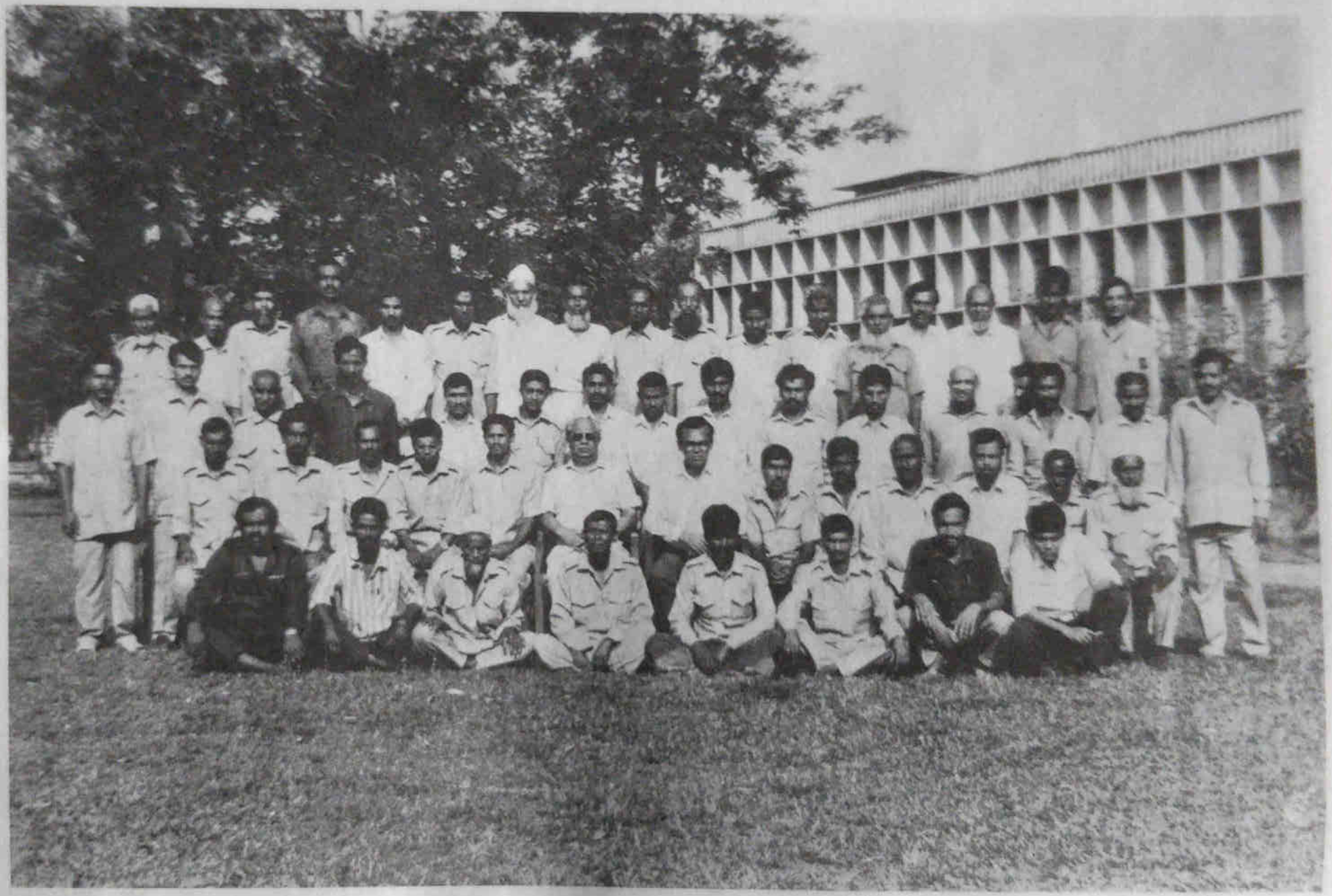

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কলেজের ব্যান্ড দলের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

জুনিয়র কাবাডি টিমের মাঝে অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

কলেজের কাব স্কাউটদের মাঝে প্রধান-উপাধ্যক্ষ

কলেজের বয় স্কাউটদের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কলেজ ফুটবল দলের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কলেজ ভলিবল দলের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কলেজ বাস্কেটবল দলের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কলেজ ক্রিকেট দলের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

কলেজ হকি দলের মাঝে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

লেকের শহরে কয়েকদিন
(ভ্রমণ কাহিনী)

শেখ খালিদ মোঃ ইফতেখার (রনি)
কলেজ নং ৪২৪৫
দশম মানবিক

সেদিন ছিল ২২শে ডিসেম্বর। আমি তখন ময়মনসিংহে। বাবার ডাকে ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। বাবা আমাকে বললেন তোমাকে এখুনি ঢাকায় যেতে হবে। সেখান থেকে চট্টগ্রাম যাবে। চট্টগ্রামের নাম শুনে মনটা আমার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কেননা, আমি আর বাবা বাদে সবাই তখন বেড়াতে গেছে চট্টগ্রামে। আর সবার সাথে বেড়ানোর জন্য আমার ভ্রমণ-বিলাসী মনটা উশখুশ করছিল। তাই, শীতের সকালের প্রচণ্ড শীত ভুলে গোসল করে চলে আসলাম ঢাকায়। বিকাল সাড়ে তিনটার ট্রেনে রওনা হলাম চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। ন'টার দিকে পৌঁছলাম চট্টগ্রামে। প্লাটফর্ম থেকে ওভারব্রীজে উঠার কিছুক্ষণ পরেই চলে যায় কারেন্ট। ফলে আচমকা একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায় সবাই। ব্রীজের সিঁড়ি থেকে মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই আমার চাচা আমার নাম ধরে ডাক দেন। ফলে অন্ধকারের মধ্যেই চাচাকে খুঁজে বের করতে হয় আমাকে। তাঁর সাথে যাই আমাদের মাইক্রোবাসটার কাছে। গাড়ীতে উঠে সোজা যাই বি. ডি. আর. রেস্ট হাউসে যেখানে আমাদের সবাই উঠেছে।

টি.ভি.র ধারাবাহিক নাটকের শেষাংশটুকু দেখে কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেয়ে আমাদের জন্য নির্ধারিত রুমে এসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি। গল্প করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেও বুঝতে পারিনি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনি আমাদের রাঙ্গামাটি যেতে হবে সেখানে আমার ফুফাতো ভাই থাকেন। তিনি আর্মির একজন মেজর। বর্তমানে বাংলাদেশ রাইফেলস্-এ আছেন রাঙ্গামাটি সেক্টর হেড কোয়ার্টারে। রাঙ্গামাটি যাওয়াতো এমনিতেই রিস্কি, তার উপর যদি সামরিক গাড়ী রাস্তা দিয়ে যায় তবে আর কথাই নেই। শান্তিবাহিনীর কারণে রাইফেলের গুলি লোড করে সবসময় এলার্ট হয়ে থাকতে হয়। ব্যাপারটি অনেক সৈনিকের কাছে বিরক্তকর মনে হচ্ছিল। কেউ কেউ বলছিলেন ঃ যুদ্ধহীন দেশে যুদ্ধবাজের মতো ঘুরে বেড়ানো একেবারেই বাজে জাগে। সবার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও আমার কাছে এ্যাডভেঞ্চার টাইপের মতো মনে হচ্ছিল। কারণ, এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। আমি ছিলাম বি.ডি.আরের একটি জীপের সামনে। খাঁড়া ঢালু রাস্তা দিয়ে যাবার পথে যতগুলো চেকপোস্টের সামনে দিয়ে আমাদের জীপটি গেছে সেন্ট্রিরা দেখে খালি স্যালুট দিচ্ছিল। এরকম স্যালুট জীবনে অনেকবার পেয়েছি, কিন্তু Hill Tracts-এ এই প্রথম। বলাই বাহুল্য অফিসার সাদৃশ্য আমি ছাড়া জীপে আর কেউ ছিল না। ছিল ড্রাইভার আর একজন সৈনিক। ব্যাপারটি মন্দ লাগছিল না। অন্যরা ছিল আমাদের মাইক্রোবাসে। দুপুর ১২টার দিকে খাড়া, ঢালু, আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম লেকের শহর রাঙ্গামাটিতে। পাহাড় ঘেরা এই শহরটি প্রথম দেখেই সবার মনে এক অপূর্ব শিহরণের সৃষ্টি করে।

বিকালে বিজয় মেলা দেখতে যাই। বিজয় মেলা দেখতে গিয়ে সেখানের উপজাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হই। মেলায় বিভিন্ন স্টলের মধ্যে একটি রেস্টুরেন্ট ছিলো। সেখানে আমরা পুলি পিঠার মতো এক ধরনের পিঠা খাই। ভিতরে মাংস দেওয়া। পিঠাটির নামটি এখনও আমার অজানা। তবে উপজাতীয়দের

পাজি ভূতের কাণ্ডকারখানা

খন্দকার রাজীব হোসেন
কলেজ নং S-২৪৯
সপ্তম শ্রেণী

মামদো আর গেছো-ভূত দুটোর কথা আর কি বলবো, ঝগড়া তাদের লেগেই আছে। মামদো আবার গেছোটার চেয়ে দু'বছরের বড়। তাই গেছোটাকে বড্ড শাসন করে। আর গেছো? হুম হুম করে নালিশ দেবে—

"মা, দাদা আমায় বকেছে।"

এই সেদিনের কথাই ধরা যাক। মামদো যাবে হাবলুদের বাসায় আচার চুরি করতে। গেছো বায়না ধরলো সেও যাবে। মামদো বললো—

"তুইতো একটা পিচ্চি ভূত, তোর গে কাজ নেই। তুই বরং সরল অংকগুলো কষে ফেল্।"

গেছো মনে মনে মামদো ভা'য়াকে খুব করে বকলে। ওদিকে হয়েছে কি জানো? হাবলুদের একচোখা গরুটা মামদোকে আচার চুরি করতে দেখে ফেললে। আর গিয়ে নালিশ করলো হাবলুদের গোয়ালাকে।

গোয়ালা তখন শ্যাওড়াগাছে মামদোর মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলো। মামদোর মা মামদোকে ভূত সমাজের কলংক বলে বকা দিয়ে ইচ্ছেমতো পেটালো। আর তা দেখে গেছোর সে কি হাসি। শ্যাওড়াগাছের ডালে চ্যাও দোলা খেয়ে সে মাটিতে নামে আর মামদোর দিকে চেয়ে কটকটিয়ে হাসে। মামদো পিটুনি খেতে খেতে শুধু বলে—

"দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি পাজি গোয়ালাকে।"

তারপর থেকে মামদো শুধু গোয়ালার উপর প্রতিশোধ নেয়ার ফাঁক খোঁজে। একদিন হয়েছে কি জানো বন্ধুরা? মামদো অমাবস্যার রাতে শ্মশানের তেঁতুল গাছে বসে এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিল। বন্ধুটা ছিল আরেকটা ভূত। তখন আবার গোয়ালা শ্মশানের সামনে দিয়ে একটা ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। গোয়ালাকে দেখে মামদোর সে-কি রাগ। সে গোয়ালার পেছন দিক দিয়ে গিয়ে গোয়ালার কান ধরে কয়েকটা আছাড় লাগাল। তারপর গোয়ালাকে তেঁতুল গাছের মগডালের সাথে উল্টো করে পা দুটো বেঁধে চলে গেলো। তখন গোয়ালা বুঝলো মামদো এ কাজ করেছে। গোয়ালা ভয়ে অস্থির হলো সারারাত শ্মশানে থেকে পরদিন হাবলুদের বাড়ির লোকেরা গোয়ালাকে দেখে নামিয়ে নিয়ে চলে গেলো। আর ইলিশ মাছটার কি হলো তা জানতে নিশ্চয় তোমাদের ইচ্ছে করছে? আসলে আমি নিজেও তা জানি না। তবে আমার মনে হয় মামদো মাছটা নিয়ে গিয়েছিল। তারপর মামদো কতবার যে আচার চুরি করেছে আর একচোখা গরু গিয়ে নালিশ করেছে গোয়ালার কাছে তার হিসেব আমার কাছে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি যে, গোয়ালা আর কোনদিন মামদোর মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ দেয়নি। উল্টা দুষ্ট গরুকে পিটুনি দিয়েছে।

বিস্মৃত নাম জলধর সেন

আবু নাসের রাজীব
কলেজ নং ৫৯৬২
একাদশ মানবিক

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন, জলধর সেন তাদের অন্যতম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এককালের এই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও কথা শিল্পী, ভ্রমণ কাহিনীকার, জীবনচরিত্র লেখক, সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেও জলধর সেন আজ হারিয়ে যাওয়া একটি নাম। তিনি বর্তমান যুগের সাহিত্যিক, সমালোচকদের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছেন। আজ তাঁর নাম শুধুই ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ। তাকে নিয়ে কোন সেমিনারের আয়োজন হয় না। হয় না তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা। আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এই পুরাতন সাহিত্যিককে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

জলধর সেন বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার একটি ক্ষুদ্র থানা কুমারখালীতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬০ সালে ১৩ই মার্চ মঙ্গলবার রাত ১০টা ২২ মিনিটে। তিনি সাধারণ এক মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জলধর সেনের বাবা প্রথম জীবনে এতই দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁকে কুমারখালীর বাজারে এক দোকানে চাকুরি নিতে হয়। মাত্র তিন বছর বয়সে জলধর সেন পিতৃহীন হন। ১৮৬৩ সালে জলধর সেনের পিতার চির বিদায়ের সাথে সাথে তাঁদের পরিবারে নেমে আসে এক দুর্বিসহ অবস্থা। জলধর সেনের নিজের ভাষায়, "আমার পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লাম।"

জলধর সেনের পিতার মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন কুমারখালী থেকে প্রকাশিত তৎকালীন সাহিত্য পত্রিকা "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা"-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। পরবর্তীতে জলধর সেনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জলধর সেনের বিদ্যাচর্চার হাতেখড়িও হয় কাঙাল হরিনাথের হাতে। তিনি স্মরণ করেছেন, —"আমাদের হাতেখড়ি দিয়েছিলেন আমাদের পরম পূজনীয় পরমারাধ্য কাঙাল হরিনাথ।"

জলধর সেন কুমারখালী বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এই বিদ্যালয়েই তাঁর সতীর্থ ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। এই স্কুলে ভর্তি হওয়াতেও কাঙাল হরিনাথের যথেষ্ট হাত ছিল। জলধর সেন বাংলা সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হলেও তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, অংকের মত জটিল শাস্ত্র তাঁর মাথাতে কোন সময়েই ঢুকত না। "ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব আর পাটি গণিত, এই দু'টো কিছুতেই আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করত না। অথচ সে সময়ে সকলেই বলতেন যে, আমার দেহের গঠনের অনুপাতে মাথাটা নাকি বড় ছিল।" পরবর্তী জীবনে কঠিন অধ্যাবসয়ে জলধর সেন গণিত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। জলধর সেনের লেখাপড়ার ছেদ পরে তাঁর চোখের রোগের কারণে। কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের প্রচেষ্টায় তার পড়াশুনা দু'বছর স্থগিত রেখে তাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়। কলকাতা থেকে ফিরে এসে অপরিসীম দারিদ্র্য আর প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি কুমারখালী স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে মাসিক দশ টাকা থার্ড গ্রেডে স্কলারশীপ লাভ করেন।

জলধর সেনের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু জলধর সেনের মত দরিদ্র ঘরের সন্তানের এ আকাঙ্খা ছিল আকাশ-কুসুম কল্পনা। জলধর সেন ১৮৭৯ সালে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। জলধর সেনের নিকট সবচেয়ে দুর্বোধ্য ছিল সংস্কৃতি। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে সংস্কৃতভাষা পড়তে হয়েছিল। আর এই সংস্কৃতের জন্যেই তিনি এল, এ, পাশ করতে পারেননি। জলধর সেনের জীবন কাঙাল হরিনাথের আদর্শে এমনভাবে বাধা ছিল যে কাঙালের নির্দেশে জলধর সেনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। জলধর সেনের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হলেও মাত্র আড়াই বছর স্থায়ী ছিল। কেননা ১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে জলধর সেনের স্ত্রী, সুকুমারী, কলেরা রোগে মৃত্যুবরণ করেন। এর মাঝে ২৪ দিন আগে সুকুমারীর সদ্যপ্রসবকৃত কন্যা সন্তানও মারা যায়। সুকুমারীর মৃত্যুর তিনমাস পর জলধর সেন মাতৃহারা হন। মাত্র চারমাসের ব্যবধানে তিন প্রিয়জনের মৃত্যুতে জলধর সেনের জীবনে দেখা দেয় বৈরাগ্য। মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য হরিনাথ মজুমদারের নির্দেশে হিমালয়ে গমন করেন তিনি। জলধর সেনের এই হিমালয় ভ্রমণের ফলেই বাংলা সাহিত্য লাভ করে এক চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী। জলধর সেনের হিমালয় ভ্রমণকে কেন্দ্র করে রচনা করেন "হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী"। যা তৎকালীন পাঠকদেরকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল এবং এই একটি মাত্র ভ্রমণ কাহিনীর জন্য জলধর সেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।

জলধরের যৌবন কালে কুমারখালীতে সংস্কৃতি চর্চার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। কাঙাল হরিনাথের নেতৃত্বে মীর মোশাররফ হোসেন, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যানব, দীনেন্দ্র কুমার রায় ও জলধর সেন সাহিত্য চর্চা করেন। জলধর সেনের প্রকৃত সাহিত্য গুরু কাঙাল হরিনাথ। ছোটবেলা থেকেই জলধরের মনে সাহিত্যের বীজ রোপণ করেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। জলধর সেনের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়িও হয় হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত কুমারখালী থেকে প্রকাশিত তৎকালীন সময়ের জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা "গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার" মাধ্যমে। জলধর সেনের আত্মজীবনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমি আমার সাহিত্য সেবার প্রেরণা পেয়েছিলাম কাঙাল হরিনাথের কাছে। আর সুযোগ পেয়েছিলাম "গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে জলধর সেন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত "ভারত বর্ষের" ন্যায় একটি উচ্চমানের পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন।

একমাত্র কবিতা ও নাটক ছাড়া বাংলা সাহিত্যেই সর্ব ক্ষেত্রেই জলধর সেনের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তার ভ্রমণ কাহিনী। তাঁর ভ্রমণকাহিনী পাঠকদের মনে কি নির্মল আনন্দ দিয়ে ছিল তা বিভিন্ন সাহিত্যিকের জলধর সম্পর্কে মূল্যায়ন থেকেই বোঝা যায়। প্রফুল্ল কুমার সরকারের ভাষায়, 'জলধর সেনের পূর্বেও বাংলা ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনেক লিখেছিলেন। কিন্তু ভ্রমণ কাহিনীকে যে রূপে প্রাণময় ও সরস করিয়া তুলিতে হয়, তাহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে উন্নীত করা যায়। জলধর সেনই বোধ হয় প্রথম সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।' জোৎস্নানাথ চন্দ্র মন্তব্য করেন, 'চশারকে যদি Father of English Prose বলতে হয়তো জলধর সেনকেও বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনীর সৃষ্টিকর্তা বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথমে যে দুই-তিনজন লেখক ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করেন জলধর সেন তাদের অন্যতম। তার ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে প্রবাস

দূরে সরিয়ে রেখেছেন। প্রিয়জনের আঘাত তিনি সয়েছেন নিরব থেকে। জলধর সেন সম্পর্কে যে সব সাহিত্যিক, বিজলেখক তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি আবেগ মিশ্রিত মার্জিত ভাষায় অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে সেই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।

ধর্মের দিক দিয়ে জলধর সেন ছিলেন উদার মানব। তিনি ছিলেন ধর্মের জড়তা মুক্ত একজন পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সকল রক্ষণশীলতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন তার লেখনি ও কার্যকলাপের মাধ্যমে। ছোটবেলা থেকেই জলধর সেন মনে প্রাণে সনাতন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন না। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি জলধর সেনের আকর্ষণ ছিল অধিক। কিন্তু তার সাহিত্য কর্মে ধর্মাধর্ম নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠে নাই। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষকে। তাই এই মানুষদের নিয়েই তিনি গড়েছেন সাহিত্যের এক বিশাল সাম্রাজ্য।

সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন মানুষকে আনন্দ দানের জন্য; কিন্তু এক কালে মানুষ তাকে ভুলে যাবে এ বোধ হয় সাহিত্যিকেরা আশা করেন না। হতে পারে জলধর সেনের সাহিত্য প্রচীন সাহিত্য। আধুনিক মানসিকতার ফলে প্রাচীনকালের এই সাহিত্যিককে আমরা ভুলে যাব এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। জলধর সেনের নাম বাঙালী পাঠকদের মন থেকে মুছে গেলেও জলধর সেন বাংলা সাহিত্যকে যেটুকু দিয়ে গেছেন তার কোন তুলনা নেই। বাংলা সাহিত্য যতদিন বেঁচে থাকবে জলধর সেনের সৃষ্টি বেঁচে থাকবে বাংলা সাহিত্যে।

দূরে সরিয়ে রেখেছেন। প্রিয়জনের আঘাত চিত্র, হিমালয় পথিক, হিমাচল বক্ষে, পুরাতন পুঞ্জিকা, হিমাদ্রি, দশদিন, মুসাফির মঞ্জিল, দক্ষিণাপথ, মধ্যভারত, হিমালয়ের স্মৃতি উল্লেখযোগ্য। নৈবেদ্য নামে তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। তাঁর অন্যান্য গল্প গ্রন্থের মধ্যে ছোট কাকী অন্যান্য গল্প নতুন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প। পুরাতন পুঞ্জিকা, এক পেয়ালা চা, মায়ের নাম, বড় মানুষ প্রভৃতি। জলধর সেনের ছোট গল্পে শুধুমাত্র জমিদার শ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙালী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব চিত্রও অঙ্কন করেছেন। নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীর পক্ষ, গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের নিটোল কাহিনী, হিন্দুর অনাবিল জীবনযাত্রার পরিচয় সামাজিক ও সাংসারিক প্রেমের চিত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে জলধর সেন গড়ে তুলেন এক মৌলিক উপন্যাসের জগত। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দুঃখিনী, বিশুদাদা, করিম, বড় বাড়ী, ঈশানী, চোখের জল, পরশ পাথর, ভবিতব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জলধর সেনের অকৃত্রিম অবদানে বাংলা সাহিত্য লাভ করে ১৬ খানা মৌলিক উপন্যাস। যা বাংলা সাহিত্যের পরম পাওয়া।

জলধর সেনের সমসাময়িক বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁদের নানা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "চারিত্রিক দিক দিয়ে জলধর সেন ছিলেন সহজ-সরল, অহমিকা বর্জিত বন্ধু বাৎসল্য, কর্তব্য নিষ্ঠ, ভোজন-রসিক আর হাস্য পরিহাস প্রিয় মেজাজের মানুষ। জলধর সেনের জীবনে যত প্রতিকুলতা এসেছে তা তিনি সংযম দিয়ে

আমি তো দেখেনি বিজয়

মুহঃ জেহাদউদ্দীন (তারেক)
কলেজ নং ৫৭২৪
দ্বাদশ বাণিজ্য

দেশ বিজয়ের নাকি
কুড়িটি বছর পেরিয়ে গেল।
সেই বর্বর হানাদারদের ব্যাঘ্র থাবা থেকে
লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়ে
একটি রক্ত সাগর পেরিয়ে
যখন উঁকি মেরেছিল লাল সূর্যটা—
ভেবেছিনু-আত্মসুখে তৃপ্ত হব।
একটা পা গেছে
ক্ষতি কি এমন?
অন্ধের যষ্ঠি ছেলেটা মরেছে
তা মরুক।
যখন দেখব লাখো ছেলের ওষ্ঠে
নির্মল হাসি
আর দেশের মাটিতে স্বদেশী লোকেরা
নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে
চলছে, ফিরছে
আত্মসুখে তখন আত্মহারা হব।
শাসন ত্রাসনের ব্যূহ ভেদ করি,
যখন এনেছিনু লাল সূর্যটারে
ভেবেছিনু-সুখ পাব, স্বস্তি পাব।
সেই রেসকোর্স মাঠে
সেদিন পাপিষ্ঠদের অবনত মুখ
দেখতে গিয়েছিনু ;
দারুণ লেগেছিল—
শুধু নয় মাসের নয়
কয়েক নয় বছরের
শোষণের শক্ত হাতটারে
অথর্ব অবস্থায় দেখতে।
ভুলেই গিয়েছিনু সেদিন
পায়ের বেদনা
আর পুত্রের শোক।
খুশিতে সেদিন রক্ত টগবগিয়ে উঠেছিল।
মনে পড়ে আজও
সেদিন স্বগতোক্তিঃ
"নিজের দেশকে নিজেরা গড়ব।,'
নিজের ভাগ্য নিজেরা সাজাব।"
কিন্তু তারপর
দেশ তো স্বাধীন হল
বিজয় আমাদের হল—
সবার সাথে সেদিন আমিও
বুক ফুলিয়ে বলেছিলুম
"বিজয় আমাদের হল।"
কিন্তু তারপর?
আমি তো দেখিনি বিজয়।
কেবল দেখেছি অত্যাচারের নতুন রূপ
শোষকের নতুন চেহারা
আর শোষিতের আরও তীব্র
আরও করুণ আহাজারি।
একটি অবলা অসহায়া নারী
যখন রাস্তায় নির্যাতনের শিকার,
যখন ভেসে উঠে চোখে
শ্রীমতী কোন কিশোরীর
এসিডদগ্ধ হতশ্রী চেহার,
যখন দেখি শিক্ষা মন্দিরে
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি,
আর রক্তের হোলিখেলা,
আর শাপলা চত্বরে যখন শুনি
নেতা-নেত্রীদের গলা ফাটানো
স্বার্থ হাসিলের মিথ্যে বুলি,
তখন ভাবিঃ আর ভাবিঃ
'এই কি সেই বিজয়,
এই কি সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন?
হৃদয় আমার কেবলই বলেঃ
'আমি তো দেখেনি বিজয়।'

পারমাণবিক সন্ত্রাস এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

কামরুল আহমেদ
কলেজ নং ৩৬৭৫
একাদশ বিজ্ঞান

আজকের সময়ে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী শব্দ হচ্ছে 'সন্ত্রাস'। আর সকল প্রকার সন্ত্রাসের মধ্যে ভয়ঙ্করতম পরিচিত লাভ করেছে পারমানবিক সন্ত্রাস—যা মানবজাতির সহস্র বছর ধরে গড়ে তোলা সভ্যতাকে নিমেষে ধ্বংস করে দেবার হুমকি সৃষ্টি করেছে। এই শ্বেত সন্ত্রাস দমন করা প্রয়োজন। আর তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই সম্পর্কে সমষ্টিক সচেতনার। সেই চেষ্টাতেই এই কথিকার অবতারণা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন প্রজাতন্ত্রের (সাবেক) রাজধানী কিয়েভ থেকে ১২৩ কিঃ মিঃ উত্তরে প্রিপিয়াত শহরের অদূরে অবস্থিত চেরোনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা আমরা এখনও ভুলে যাইনি। এর বিকিরণজনিত কারণে ধীর মৃত্যুর সংখ্যা ৭০ বছরের মধ্যে সাড়ে সাত হাজারে দাঁড়াবে বলে বিজ্ঞানীগণ আশংকা প্রকাশ করেছেন। যেখানে চেরনোবিল দুর্ঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হলো তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যু ছাড়াও সুদূরপ্রসারী পরিণতি নিয়ে দুশ্চিন্তার ছায়াপাত, সেখানে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের পর কী অকল্পনীয় ভয়াবহ পরিণতি মানবসমাজের ভাগ্যে ঘটবে তা আজকে আর অনুমান নির্ভর নয়। আসুন এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক—

যে কোনভাবে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হোকনা কেন, সেক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার সম্ভবনা কেবল কাল্পনিক আশংকণীয়। বিগত বছরগুলোতে পরাশক্তিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় একই ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণতিতে বর্ষব্যাপী পারমানবিক শীতকাল ও পারমানবিক রাত্রি পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে। যার ভয়াবহতা সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা করা হবে।

সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো, পারমানবিক যুদ্ধের পর কেবলমাত্র আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতই বায়ুমণ্ডলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। অর্থাৎ কম সময়ের জন্য উত্থিত ধূলিমেঘ সূর্যালোক আটকে রাখবে কিয়ৎকাল এবং কম সময়ের জন্য পৃথিবী সূর্যালোক বঞ্চিত হবে। পরবর্তী সময়ে মার্কিন গবেষক এস, গ্লাসস্টোন এবং পি. ডোলান হিসেব করে দেখিয়েছেন, এক মেগাটন পারমাণবিক বিস্ফোরণে ১০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত ৩ থেকে ৪ লাখ টন ধূলি উৎক্ষিপ্ত হবে। ১০ হাজার মেগাটন পারমাণবিক বিস্ফোরণে ৩০০ কোটি থেকে ৪০০ কোটি টন ধূলি সৃষ্টি হবে বায়ুমণ্ডলে। এই ধূলিমেঘ মাধ্যাকর্ষণ ও অধঃক্ষেপণে শীঘ্রই থিতিয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষুদ্র কণাসমূহ আকাশে মেঘের আকারে থেকে যাবে এবং এক বছরেরও বেশী সময় ধরে সূর্যের বেশীর ভাগ তাপ শোষণ করে নেবে।

কিন্তু হিসেবের মধ্যে আগুনে ঝড়ের কথা ধরা হয়নি। ধূলিমেঘ ছাড়াও এর ফলে সৃষ্ট ঝুল বায়ুমণ্ডল আচ্ছাদিত করবে। সাবেক পশ্চিম জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটের কুড্জন এবং পরবর্তীকালে কয়েকজন জার্মান বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেছেন যে, নগর ও বনাঞ্চলে আগুন ধরে যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমাবর্ষণে হামবুর্গ ও ড্রেসডেন আগুনে ঝড়ে নিহতের সংখ্যা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমাবর্ষণে নিহতের সংখ্যার চেয়ে বেশী বই

কম ছিল না। টোকিওতেও বোমাবর্ষণে আগুনে ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিলো।

১৯৬১ সালে মার্কিন গবেষক জে. হিল প্রমাণ করেন যে, এক, তিন ও দশ মেগাটন পারমাণবিক বোমা যথাক্রমে ৫০০, ১০০০ ও ২১০০ বর্গ কি. মি. বন পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রের ১৩ শতাংশ ব্যবহারের ফলে ৯০ লাখ বর্গ কি. মি. বন ধ্বংস হবে এবং এর ফলে সৃষ্ট ৪০০ টন ঝুলের জন্য সূর্যের আলোর অর্ধেক পরিমাণ পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছাবে না। শহরাঞ্চলে দাহ্য পদার্থের আধিক্যহেতু ঝুলের পরিমাণ আরো বাড়বে এবং তার ঘনত্ব হবে শতগুণ বেশী। এই ঝুলমেঘই পৃথিবীতে বর্ষব্যাপী দীর্ঘরাত সৃষ্টি করবে আর তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পারমাণবিক শীত উত্তর গোলার্ধকে গ্রাস করবে। আবার সমুদ্রের পানি অধিক তাপধারণক্ষম বলে যখন স্থল-ভাগের শৈত্য হবে মারাত্মক, তখন সমুদ্রের তাপমাত্রা থাকবে বেশী। এর ফলে সৃষ্ট প্রবল ঝড় উপকূল এলাকায় মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। একই সূত্র ধরে দক্ষিণ গোলার্ধও পারমাণবিক শীতের শিকার হবে দীর্ঘ পারমাণবিক রাতের কারণে।

সূর্যের অভাবে আলোক সংশ্লেষণ বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী বৃক্ষহীন মরুভূমিতে পরিণত হবে। ধ্বংস হবে মানুষসহ সকল সামুদ্রিক এবং স্থলজ প্রাণী। বিচ্ছিন্নভাবে কোন প্রাণের চিহ্ন যদি কোথাও থেকেও যায়, তবুও পৃথিবী মনুষ্য বাসোপযোগী হতে সময় নেবে ১০ লাখ বছর। অর্থাৎ পৃথিবী আর কোনকালেই মানুষের মুখ দেখবেনা।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরে অনুষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, একটি পারমাণবিক যুদ্ধের পর কেবলমাত্র গণ দুর্ভিক্ষেই সাড়ে চারশো কোটি লোক মারা যাবে।

তেজস্ক্রিয়তাও বাড়বে বায়ুমণ্ডলে। প্রতি-বছর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ২০ শতাংশ করে বেড়ে চলেছে। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা আগামী দুই দশকের মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। গলে যাবে মেরু অঞ্চলের অনেক বরফ। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে তলিয়ে যাবে বাংলাদেশসহ অসংখ্য নিচু দেশ। ঘটবে শষ্যহানী। শস্যের মধ্যে ক্ষতিকারক বেগুনি রশ্মি পড়ার ফলে তা বিষাক্ত হয়ে মানবদেহে ত্বক ক্যান্সার হতে শুরু করে নানা জীবন-বিনাশী রোগের উদ্ভব ঘটাবে। এত প্রতি-কূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকা মানবসমাজ তখন সত্যিই ফিরে যাবে সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগের আদিম যুগে, যখন বনের পশুর সাথে মানুষের ছিলনা কোন ভেদাভেদ।

একটি সতেজ ফুল ফোঁটাতে এই সুজলা পৃথিবীর সময় লেগেছে সহস্র বছর। অথচ বর্তমানে পৃথিবীর যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র আছে তাতে মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবী এই মহাজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আর এই বিভীষিকা সৃষ্টিকারী আমরাই। কারণ পৃথিবীতে এখন কম করে হলেও ৫০ হাজারের উপর পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। যার দ্বারা সমগ্র পৃথিবী বারো বার ধ্বংস করা যাবে। শুধু তাই নয় এই মারাত্মক শক্তি গুড়িয়ে দিতে পারে সৌরজগতের চারটি গ্রহকেও। পরাশক্তির রক্তলোলুপতা আমাদেরকে পরীক্ষা-গারের গিনিপিগে পরিণত করেছে। দশটা পরমাণুবাহী বিমান তৈরীতে যে খরচ হয় তা দিয়ে ১ বিলিয়ন মানুষকে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। এই টাকায় আফ্রিকার চৌদ্দ মিলিয়ন রোগাক্রান্ত শিশুকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ১৫০ টি এল এক্স ক্ষেপণাস্ত্রের খরচ দিয়ে রক্ষা করা সম্ভব ছিলো পৃথিবীর ৫৭৫ মিলিয়ন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোককে।

মাত্র দুটি তাইফুন সাব-মেরিনের খরচ দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। ইউনিসেফ কর্তৃক গৃহীত ৫০০ মিলিয়ন দারিদ্রপীড়িত শিশুকে বাঁচাবার কর্ম-সূচীকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিলো ১০০টি উন্নতমানের B-1 F বোমারু বিমান তৈরির খরচের বিনিময়ে। যেখানে সভ্যতা তার সামনেই দেখতে পাচ্ছে প্রলয়কে, সেখানে পরাশক্তিসমূহ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার পেছনে প্রতি মিনিটে ব্যয় করছে ২০ লাখ মার্কিন ডলার। ধরিত্রী তার সন্তানের এই হিংসাত্মক উন্মত্ততা কতক্ষণ সহ্য করবে সেটাই জিজ্ঞাস্য। কেননা প্রকৃতি অনিয়ম সহ্য করে না।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

* The Bncyclopaedia Britannica 15th edition, 1979
* A Race to Nowhere by Pax Christi.
* সংবাদ ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৯৩
* পারমাণবিক সন্ত্রাস ও শান্তির অন্বেষা-
  সুলিয়ানা গিওয়াত্তির ও
  বি. ডেভিড উইলিয়াম।
* রহস্যময় বিজ্ঞান—আলী ইমাম।

সাগর তলেই যাবো

গোলাম কিবরিয়া জুয়েল
কলেজ নং ৪১৭৯
দশম বিজ্ঞান

আব্বা গেছেন জাপান দেশে
নাইজেরিয়ায় কাকা,
বিলেতফেরৎ মামা এবার
থেকেই যাবেন ঢাকা।

ইণ্ডিয়াতে চাচার আছে
নিউ মডেলের গাড়ি,
অষ্ট্রেলিয়ায় ছোট খালু
রাতেই দেবেন পাড়ি।

ভাইয়া নাকি সিঙ্গাপুরে
চলেই যাবে আজ,
আমেরিকায় বড় বোনের
হাতে বিরাট কাজ।

চীনে থাকেন বুড়ো দাদু
সাইবেরিয়ায় নানা,
ইটালীতে নানীর যেতে
নেইকো কোন মানা।

কাঁচা মাছ আর শ্যাওলাপাতা
এখন থেকেই খাবো,
অনেক ভেবে ঠিক করেছি
সাগরতলেই যাবো।

কৌতুক

সংগ্রহ ঃ মোঃ আরিফুল ইসলাম

কলেজ নং S-২০২

অষ্টম শ্রেণী

১ম বন্ধু ঃ জানিস, আমি না একবার চারতলা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

২য় বন্ধু ঃ মরে গিয়েছিলি বুঝি?

১ম বন্ধু ঃ মনে নেইরে। অনেকদিন আগের কথাতো...

o o o o

দুই বন্ধু আলাপ করছে—

১ম বন্ধু ঃ "আমি দৌড়টা ভালই রপ্ত করেছি। কিন্তু, ভাই সাঁতারটা কিছুতেই শিখতে পারছি না।..."

২য় বন্ধু ঃ "তাতে কি? ডুবে গেলে পানির নিচে মাটি পেয়ে যাবি। তখন এক দৌড়ে পাড়ে উঠে পড়বি।..."

o o o o

চিত্র প্রদর্শনীতে গেছেন এক বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি ছবির কিছুই বোঝেন না। একটি ছবির সামনে খুব জটলা। ছবিটির নাম মৃত্যু। ছবিতে একজন মৃত ব্যক্তি মাঠে পড়ে আছে। ডাক্তারকে তার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ কি রকম দেখছো?

ডাক্তার বললেন—

ঃ চোখ মুখে হলদে ভাব দেখছি। এটা জণ্ডিসের কেস ছিল।...

॥ দুই ॥

সংগ্রহ ঃ তওফিকুর রহমান (প্রিন্স)

কলেজ নং ৭৩৩৫

দশম মানবিক

অতিথি ঃ কি সুন্দর লাইব্রেরী আপনার। কত দুর্লভ বইয়ের সংগ্রহ। কি যে লোভ হচ্ছে পড়বার। আমি কি মাঝে মাঝে ধার নিতে পারি?

ভদ্রলোক ঃ জী না, এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই চলে যাক তা আমার ইচ্ছে নয়।

o o o o

বাৎসরিক পরীক্ষার আগে—

প্রধান শিক্ষক ঃ তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি আগামী ৫ই ডিসেম্বর থেকে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, প্রশ্নপত্র প্রেসে জমা দেয়া হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বক্তব্য আছে?

ছাত্ররা : (সমবেতভাবে) কোন প্রেসে স্যার?

o o o o

১ম বন্ধু ঃ মুরগীর বাচ্চা যখন ডিমের খোলস ভেঙ্গে বের হয় তখন খুব আশ্চর্য লাগে তাই না?

২য় বন্ধু ঃ এ আর এমন কি। আসল আশ্চর্য আস্ত বাচ্চাটা ডিমের মধ্যে ঢোকে কি করে?

o o o o

ছেলে ঃ মা একটা আইসক্রীম খাবো।

মা ঃ খাস্‌নে সোনা, ঠাণ্ডা লাগবে।

ছেলে ঃ কিছু হবে না, মা চাদর গায়ে দিয়ে খেয়ে নেব।

o o o o

হোটেলে পিতা-পুত্র খেতে বসেছে। পুত্র ডিম সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাচ্ছে। ডিম ভেঙ্গে দেখে মুরগীর বাচ্চার মত যেন কি।

পুত্র ঃ বাবা ডিমের ভেতর বাচ্চা।

পিতা ঃ তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, মালিক দেখলে বাচ্চার দাম চাইবে।

০ ০ ০ ০

ছাত্র ঃ স্যার আমি তো ০ (শূন্য) পেতে পারি না।

শিক্ষক ঃ এর থেকে নিম্ন মার্কের যে আর কিছুই নেই।

০ ০ ০ ০

মাস্টার ঃ হ্যাঁরে রনি বলতে পারিস খোদা কান দিয়েছেন কেন?

রনি ঃ জী স্যার, আপনার কানমলা খাবার জন্য।

০ ০ ০ ০

এক ব্যক্তি তার ছেলেকে বললো, বলতো খোকা চাঁদ দূরে না লণ্ডন দূরে?

খোকা উত্তর দিল, লণ্ডন দূরে।

পিতা রেগে বললেন, কেন?

খোকা বললো, চাঁদতো দেখা যায়, কিন্তু লণ্ডন তো দেখা যায় না।

০ ০ ০ ০

আপন তার দুই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো--তুমি যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাও যে তুমি লক্ষপতি হয়ে গেছ তখন তুমি কি করবে?

আরেফিন ঃ আমি বিশ্বভ্রমণে বের হয়ে যাব। আর খুব মজা করে দিন কাটাব।

তানিম ঃ আমি আবার ঘুমিয়ে পড়বো আর কোটিপতি হবার জন্য অপেক্ষা করবো।

০ ০ ০ ০

এক কৃষকের ছেলে স্কুল থেকে এসে—

ছেলে ঃ বাবা, গাইবাছা কোথায় বলতে পারিনি বলে স্যার আমাকে মেরেছেন।

কৃষক ঃ গাই কোথায় বাছা থাকে তাও জানোছ না, গাইতো বাছা থাকে গোয়াল ঘরে।

উকিল ঃ (কাঁঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষীকে) আপনার যা বলার বলুন।

সাক্ষী ঃ বাংলায় না ইংরেজীতে কইতাম?

জজ সাহেব ঃ (আশ্চর্য হয়ে গেলেন) যাক, ইংরেজীতেই বলুন।

সাক্ষী ঃ ওকে মারিয়াছে আমি দেখিয়াছি।

জজ সাহেব ঃ এইবার বাংলায় বলুন তো।

সাক্ষী ঃ অক মারছে আই দেখছি।

০ ০ ০ ০

১ম ব্যক্তি ঃ (২য় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে) ভাই হাসপাতালটা কোথায়?

২য় ব্যক্তি ঃ ঐ যে সামনে ট্রাকটা আসছে তার তলায় শুয়ে পড়ুন। দেখবেন আপনি হাসপাতালে পৌঁছে গেছেন।

০ ০ ০ ০

শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন বলোতো ফারুক 'অনুগ্রহ পূর্বক, শব্দ দ্বারা কি কি বাক্য রচনা করা যায়?

ফারুকের উত্তরঃ অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

০ ০ ০ ০

এক চোর নারিকেল গাছে নারিকেল চুরি করতে উঠে মালিককে দেখে আবার সুড় সুড় করে নেমে এল।

মালিক ঃ নারিকেল গাছে উঠছিলি কেন রে?

চোর ঃ হুজুর, ঘাস কাটতে।

মালিক ঃ বেআক্কেল নারিকেল গাছে কি ঘাস আছে?

চোর ঃ এই জন্যেই তো নেমে এলাম।

০ ০ ০ ০

শিক্ষক ঃ Rahim Killed a Tiger. এটা কোন Case।

ছাত্র ঃ স্যার মার্ডার Case।

শিক্ষক ঃ হলো না।

ছাত্র ঃ কেন স্যার রহিম যে বাঘটাকে মেরে ফেলেছে।

চাকুরীর মৌখিক পরীক্ষা চলছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ 'সে গেল তো গেল এমনভাবে গেল যে ফিরে এল না'—ইংরেজী বলুন।

চাকুরী প্রার্থী ঃ (একটু চিন্তা করে) হি ওয়েন্ট টু ওয়েন্ট এমনভাবে ওয়েন্ট আর ডিড নট কাম।

॥ তিন ॥

সংগ্রহ ঃ রাশেদুল ইসলাম

কলেজ নং ৫৪৮৪

পঞ্চম শ্রেণী

মা ঃ দেয়ালে রঙ লাগিয়েছ কেন? তোমার বাবা এসে বেশ মজা দেখাবেন, দেখো।

ছেলে ঃ বাবা তো দেখে ফেলেছেন।

মা ঃ কিছু বলেননি?

ছেলে ঃ হ্যাঁ বলেছেন। তিনিও বল্লেন, "তোমার মা এসে দেখলে মজা দেখাবেন।"

॥ চাই ॥

সংগ্রহ ঃ তৌফিক মাহমুদ

কলেজ নং ৫৪৬৯

পঞ্চম শ্রেণী

১ম ব্যক্তি ঃ আচ্ছা ভাই এই রাস্তাটি কি হাসপাতালে গিয়েছে?

২য় ব্যক্তি ঃ আরে ভাই আপনি গাধা নাকি!

১ম ব্যক্তি ঃ কেন ভাই?

২য় ব্যক্তি ঃ রাস্তার কি অসুখ হয়েছে যে তা হাসপাতালে যাবে?

॥ পাঁচ ॥

সংগ্রহ ঃ সাইফুল তারেক ফুয়াদ

কলেজ নং ৫২২৩

ষষ্ঠ শ্রেণী

শিক্ষক ঃ "মানুষটি গাছ থেকে পড়ে গেল", এখানে মানুষ কোন পদ?

দুষ্ট ছাত্র ঃ স্যার, বিপদ।

শিক্ষক ঃ (অবাক হয়ে) তুমি তো দেখছি বেশ বুদ্ধি রাখ।

বোকা ছাত্র ঃ স্যার, তাহলে আমরা কি পদ ছয় প্রকার লিখব?

॥ ছয় ॥

সংগ্রহ ঃ মোঃ সাঈদ ইবনে ফয়েজ

কলেজ নং ৫৭২৭

চতুর্থ শ্রেণী

লঞ্চ মাঝ নদীতে, যাত্রী ও ভারী মালের ওজনে লঞ্চ প্রায় ডুবো ডুবো।

তাই মাঝি যাত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বল্লো, "ভাইসব, কিছু ভারী মাল নদীতে ফেলে না দিলে লঞ্চ বাঁচানো যাবে না।"

তা শুনে এক যাত্রী বলে উঠল, "মাল ফেলবো কেন? কিছু ভারী মাল লঞ্চের মেঝে থেকে ছাদের উপরে তুলে রাখলেই হয়।"

মন্ত্রীর পদত্যাগ

মু· জেহাদ উদ্দিন
কলেজ নং ৫৭২৪
দ্বাদশ মানবিক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

(স্থান : রাজধানীতিকের বাসভবন। কাল ঃ সন্ধ্যা।

ড্রয়িং রুমে নেতা একাকী বসা। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। দেয়ালে কয়েকটি সৌখিন তৈলচিত্র। একপার্শ্বে সিরাজউদ্দৌল্লা, অপর পার্শ্বে জিন্নাহ্‌র ইয়া বড় সাইজের দু'টি ছবি। মেঝেতে দামী কার্পেট। আর সোফাগুলো স্ব-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল—যেন কোন রাজবাহাদুরের আসন একেকটি। নেতা উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। নজর পড়ল সিরাজের দিকে। রুমে রুমের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে)

নেতা ঃ (স্বগতোক্তি) নবাব সিরাজ বাহাদুর, তোর সময় যদি সূর্যটা অস্ত না যেত - - - -

(সাঁ করে জিন্নাহর ছবির পার্শ্বে গিয়ে)

আর পাকের বাচ্চা জিন্নাহ, সূর্যটাকে ফের আনতে গেলি কোন দুঃখে?

(তারেকের প্রবেশ)

তারেক ঃ বাবা, কি যেন আবোল-তাবোল বকতে ছিলে - - - - - বলি, ফের পাগল হয়ে যাওনি তো?

নেতা : হইনি। তবে হওয়াটা অস্বাভাবিকও না। বস্ বাবা বস্, দুঃখের বন্ধু তুই-ই হলে - - - - তোর কাছেই জ্বালাটা বলি,

(তারেককে হেঁচকাটানে বসিয়ে)

ইতিহাস তো পড়েছিস্ - - -উমিচাঁদকে বিদেশী বেনিয়ারা বানিয়েছিল Mad, কিন্তু আমাকে দেশী বেনিয়ারা আরও কিছু বানিয়ে ছাড়বো - - - -

তারেক ঃ কি বলছ? মাথায় পানি দেয়া লাগবে না তো?

নেতা : (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) না, লাগবে না। এভারেস্টের বরফের স্তূপটা যদি মাথায় ধরতে পারিস—তবে যদি সুখনিদ্রা হয়।

(হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে—অস্থির হয়ে)

বল্ বাবা বল্, আমি কার জন্য এতসব করলাম? সোনার অঙ্গটা ছারখার করলাম, সুখনিদ্রা জলে ভাসালাম; অভ্যুত্থানের সময় পার্টির চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি. ইলেকশনের সময় দেশ সফর করেছি—কত সমাবেশে কত বুলি আওড়িয়েছি। আর বিনিময়ে?- -

তারেক ঃ কেন, তুমি গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছ। তুমি না বলতে দেশের সেবা - - - -

নেতা ঃ ছাই তোর দেশের সেবা! নিজে বাঁচলে দেশ। দেশ বাঁচলে আমার কি?

তারেক ঃ দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।

নেতা ঃ ওসব বুলি মুখস্থ করে রাখ্—বক্তৃতায় ছাড়তে পারবি—যেমন করি আমি। (বুকে জড়িয়ে) আরে দেখতে হবে না কার ছেলে? (তারেক কি বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দেয়া হল)

নেতা ঃ (অস্থির চিত্তে) বিদেশী বেনিয়ারাই ভাল ছিল—তাবেদারী করে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে খাইতে পারতাম।

তারেক ঃ আর দেশের?

নেতা ঃ দেশ জাহান্নামে যাক। দেশ আমাকে কি দিয়েছে? ঘোড়ার ডিম! চোখের মাথা খেয়েছিস্? দেখতে পাস্‌না বিশতলা ফাউণ্ডেশনের ছয়তলা পর্যন্তই হল—বাকীটা?

তারেক ঃ হবে, বাবা হবে।

নেতা ঃ হবে—কবরে গেলে হবে—আসমানের ছাদ ভেঙে হবে! (রাগে-ক্ষোভে নেতা সোফায়ই শুয়ে পড়ল)

হায়রে পোড়াকপাল, আমার সহ-নেতারা আজ একেকটা গোঁফওয়ালা মন্ত্রী—খেয়ে খেয়ে একেকটা ফুটবল হয়ে যাচ্ছে—চলে যখন মাটিতে পা লাগেনা—শূন্যে ভাসে; লাল-সবুজের পতাকা পত্‌পত্ করে উড়ে—আর আমি শালা হাড্ডিসার হয়ে---

(আছমার প্রবেশ)

আছমা ঃ (চমকে) ভাইয়াকে নিয়ে আবার কি গোলযোগ পাকিয়েছ? তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বলি, কয়টা বাজে।

নেতা ঃ এই তো, ছয়টা হবে। কেন, আজ আবার কোথাও যাওয়া হবে নাকি? যাও, গাড়ী তৈরীই আছে। যেখানে খুশী—

আছমা ঃ তোমার মুণ্ডু! আজ না তোমার পার্টির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার কথা।

নেতা। (চমকিত হয়ে) তাই তো ঃ

(হঠাৎ নীরব। কি যেন চিন্তা করে) না, যাব না।

আছমা ঃ কেন?

নেতা ঃ সেই চেয়ারম্যান এখন সরকার প্রধান, তাই যাব না।

তারেক ঃ তোমরাইতো ওকে ক্ষমতায় বসিয়েছ।

আছমা ঃ আর দেখেছ, পার্টির চুনোপুঁটিরা পর্যন্ত কাজ পেয়ে যাচ্ছে।

নেতা ঃ হ্যা, দেখেছি। আর তাই ভাবতেছি।

আছমা ঃ তবে রুই-কাতলা হয়ে তুমি কেন জলে ভেসে যাবে?

তারেক ঃ যাও বাবা। পার্টির জন্য তো অনেক করেছ।

আছমা ঃ আর সব দফতর তো এখনও বণ্টন হয়নি। আমার বিশ্বাস তুমি ভাল একটা Post-ই পাবে।

নেতা ঃ (কিছুক্ষণ নীরব, তারপর) হ্যা, তাই হবে। গাড়ীটা রেডি করতে বল। আস-কানটা আন। জিন্নাহ টুপিটা দে। আমি চললাম।

(ক্রমে আলো নিভে আসবে)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(মন্ত্রী মহাশয়ের সরকারী বাসভবন—আধুনিকতার ছোয়ায় ঝলমল করছে। সোফায় আসীন মাননীয় মন্ত্রী। পার্শ্বেই দু'টি লোক বসা। শ্রদ্ধায় শির নত)

মন্ত্রী ঃ কাজটি তোমাদেরই দিলাম। যেভাবে বললাম, ঠিক সেই ভাবে যেন হয়।

লোকদ্বয় ঃ তাই হবে মহাশয়। আমরা আজীবন আপনার গোলাম হয়েই থাকব।

(কুর্নিশ জানিয়ে প্রস্থান)

(মন্ত্রী সাহেব পত্রিকাটা হাতে নিলেন। তারেকের প্রবেশ)

তারেক ঃ বাবা, ভার্সিটি কিন্তু আজকে খোলা! গাড়ী তৈরী তো?

মন্ত্রী ঃ তোমার ভার্সিটি যাওয়া হবে না। আজই আমেরিকা যেতে হবে।

তারেক ঃ তাহলে পড়াশুনা?

মন্ত্রী ঃ আ-হা, পড়তেই তো যাবি। এইখানে সেশনজটের ঘূর্ণিপাকে, আর অস্ত্রবাজিতে জীবন দেবে নাকি?

তারেক ঃ কিন্তু - - -

মন্ত্রী ঃ কোন কিন্তু নয়। লক্ষী সোনা, যেয়ে বিশ্রাম নাও। বিকেলেই কিন্তু ফ্লাইট। আর আছমাকে একটু পাঠিয়ে দাও।

(প্রস্থান। আছমার প্রবেশ)

আছমা ঃ কেন ডেকেছ ডেডী ? আজ আবার সংবর্ধনা আছে নাকি ? বাইরে যেতে হবে ?

মন্ত্রী ঃ না, মা, এতকিছু না। তোকে না জানিয়েই একটা কাজ করে ফেলেছি। তারেককে আমেরিকা পাঠিয়ে দিচ্ছি—নাম করা এক ভার্সিটিতে।

আছমা ঃ (খুশীতে) আসল কথা। এর মরার দেশে কি শান্তি আছে ? জান-বাঁচানো ফরজ। (বাবাকে জড়িয়ে ধরে) আজই পাঠিয়ে দাওনা কেন ?

মন্ত্রী ঃ হ্যাঁ, তাই হবে। তবে- - -

আছমা ঃ তবে আবার কি ?

মন্ত্রী ঃ না, তোর ব্যাপারেও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু আমি যে বড় একা হয়ে যাই।

(ক্রিং ক্রিং ক্রিং- - - - টেলিফোন বেজে উঠল)

মন্ত্রী ঃ কে ?

টেলিফোন ঃ স্যার, আপনার এলাকার এক লোক ভেতরে আসতে চায়।

মন্ত্রী ঃ আসতে দাও।

(জলিল চৌধুরীর প্রবেশ। এসেই মন্ত্রীর পদধূলি বক্ষে ধারণ করল।)

মন্ত্রী ঃ বস, কি খবর ? পৌরসভা নির্বাচন কিন্তু অতি নিকটে।

চৌধুরী ঃ সেই জন্য চিন্তা করি না। আছে টাকা, আছেন আপনি। জয় হবেই। শুধু একটু নেক দৃষ্টি।

মন্ত্রী ঃ নেক দৃষ্টি কেন ? এটাতো আমার কর্তব্য। আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন।

চৌধুরী ঃ (সবিনয়ে) কি যেন বললেন, ঠিক ধরতে পারলাম না।

মন্ত্রী ঃ সোজা কথা—পৌরসভা আর কলেজ প্যানেলে আমাদিগকে জিততেই হবে।

চৌধুরী ঃ স্যার সমস্যা হবে কলেজ প্যানেল নিয়েই।

মন্ত্রী ঃ (রাগে) তোমাকে আমি ঘোড়ার ঘাস কাটতে দিয়েছি।

চৌধুরী ঃ ভুল বুঝবেন না মহাশয়। বলছিলাম কি, সমস্যা বাঁধিয়েছে কলেজ অথরিটি। আমাদের ছাত্রনেতাকে বহিষ্কার করেছে।

মন্ত্রী ঃ (টেবিল চাপড়িয়ে) এত বড় স্পর্ধা। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করে) সেই ছাত্রনেতাকে নিয়ে আসতে পারলেনা ?

চৌধুরী ঃ সে আরেক ঘটনা। ভার্সিটি হল থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

মন্ত্রী ঃ তবেই হয়েছে। আচ্ছা—আহাম্মক পড়ে কলেজে; ভার্সিটি হলে গেল কোন সাধে ?

চৌধুরী ঃ পার্টি'র কাজে গিয়েছিলে আর কি ?

মন্ত্রী ঃ চমৎকার। নেতাসুলভ গুণ। (টেলিফোন হাতে নিয়ে) ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।

মন্ত্রী ঃ (টেলিফোন) I am Home Minister speaking পুলিশ সুপার আছে ? পাঠিয়ে দাও।

(হন্তদন্ত হয়ে কিয়ৎক্ষণ পরেই পুলিশ সুপারের প্রবেশ)

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—বাবুল নামে একটা ছেলেকে ভার্সিটি থেকে গ্রেফতার করেছ ?

পুলিশ ঃ জ্বি স্যার, অবৈধ- - - -

মন্ত্রী ঃ ওসব শুনতে চাইনা। আমার লোক সে। সসম্মানে ছেড়ে দাও।

পুলিশ ঃ কিন্তু স্যার- - - -

মন্ত্রী ঃ No, কোন কিন্তু নয়। কথা মত কাজ কর, সার্ভিসে উন্নতি হবে। নতুবা ঢাকা থেকে সোজা বান্দরবান।

পুলিশ ঃ (কুর্নিশ করে) তাই হবে স্যার।

[প্রস্থান]

মন্ত্রী ঃ (চৌধুরীকে কাছে এনে) ঠিক আছে, তুমি আস। আর কলেজ অথরিটিকে বলবে—সামনের দরজা দিয়ে একটা ছেলেকে কলেজ থেকে বের করে দিলেও—পেছনের দরজা অনেক সময়ই তার জন্য খোলা থাকে। (প্রস্থান)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

(মন্ত্রী মহাশয় কি একটা কাজ নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এক বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়ালো।)

মন্ত্রী ঃ (মাথা তুলে চমকিত) কে তুমি ? কি চাও ? কে আসতে দিল তোমাকে ?

বুড়ি ঃ আমি মা। চাই আমার সন্তান। আমি জানি, সুউচ্চ দেয়াল ডিঙিয়ে জনতার দাবী তোমাদের কানে পৌঁছে না। শত ক্রোশ পথ হেঁটে তাই জল-কাদা পেরিয়ে, তোমার এই সুবিশাল দেয়াল ডিঙিয়ে আমি তোমার সামনে এই দেখ হাত জোড় করে দাঁড়ালাম। তবু আমার সন্তানদের ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও--

মন্ত্রী ঃ (কিংকর্তব্যবিমূঢ়) তা আমি কি করব ? কে তোমার সন্তানদের হরণ করেছে ? (পুলিশকে ডাক দিয়ে) এই বুড়ীকে বের কর এখান থেকে, কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে।

মা ঃ একটি নয়, দুটি নয়, তিন তিনটে সন্তান তুই আমার কোল ছাড়া করেছিস। ভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলাম---মানুষ হবে ; হয়ে এসেছে লাশ ; কিন্তু কেন ? জবাব চাই, কৈফিয়ত দাও। নইলে আজ খুন করে ফেলব।

(জীর্ণ শাড়ীর আঁচল থেকে একটা চাকু বের করেন। সেই মুহূর্তে পুলিশ এসে বুড়ীকে হিড় হিড় করে নিয়ে চলল বাইরের দিকে।)

মা ঃ মন্ত্রী, একদিন তোদের ভোট দিয়েছিলাম। বলেছিলে, শান্তি আসবে। বিনিময়ে আমার কোল খালি করেছিস। মায়ের নিকট সন্তান হারানোর বেদনা তুই বুঝবিনা, বুঝবিনা---না---

(বুড়ির আর্তনাদ ক্রমে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। মন্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নেপথ্যে এক বাবার আর্ত চিৎকার)

বাবা ঃ আয় খোদা, গরীব মুরুক্ষু মানুষ আমি—জমি-জিরাত বিক্রি কইরা পুলাডারে শহরে পড়তে দিছিলাম। তুমি হেরে লাশ বানাইলা ক্যান ? গরীবের সুখ তোমার ভাল লাগে না---হাঃ হাঃ হাঃ----

মন্ত্রী ঃ (ভেতর বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে) কি শুনতেছি এসব ? পাগলা বুড়ীটা কিভাবে, আর কেনই বা এল ? নেপথ্যে কি শুনলাম ? (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করে) না কিছু না। কয়েকটি ছেলে মরেছে—তাতে কি ? তাছাড়া, আমি তো মারিনি, মেরেছে পুলিশে।

(হন্তদন্ত হয়ে দু'জনের প্রবেশ)

১ম ঃ হুজুর, সংবাদ পত্র উঠে পড়ে লেগেছে। (পত্রিকাগুলো সামনে বাড়িয়ে) এই দেখুন।

মন্ত্রী ঃ (পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে) টাকায়ও কাজ হয় নি ?

১ম ঃ আজ্ঞে না।

মন্ত্রী ঃ (রাগে) যাও, ব্রাশ ফায়ার কর।

(প্রস্থান)

(২য় ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে)

খবর কি ? আজকের সভা পণ্ড করতে না পারলে আমার মন্ত্রীত্ব যাবে।

২য়ঃ (মাথা নীচু করে) কিন্তু জনতা আসছেই হুজুর।

মন্ত্রীঃ আর তোমরা পুলিশ বাহিনী নিয়ে তামাশা দেখতেছ, না?

২য়ঃ ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিল। জনতার স্রোতে তা তলিয়ে গেছে। যদি আদেশ করেন, তাহলে-----

মন্ত্রীঃ হাজার বার আদেশ করি—গুলি ছোড়—লাশের স্তুপ কর---অবাধ্য জনতা আমরা চাইনা।

(২য় ব্যক্তি প্রস্থানোদ্যত)

দাঁড়াও। এদের দাবী কি?

২য়ঃ সমস্বরে চিল্লাইতেছে—গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরতন্ত্র---ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন্ত্রীঃ (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) কত লোক হবে বললে?

২য়ঃ এতক্ষণে হয়তো রাস্তা জনসমুদ্র হয়ে গেছে।

মন্ত্রীঃ তা হোক। যাও---অস্ত্রাগার খুলতে বল—চালাও গুলি----

২য়ঃ জো হুকুম। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে গগনভেদী শ্লোগান। মন্ত্রী ভয়ে বিচলিত।)

মন্ত্রীঃ (আপন মনে) গেইটের পুলিশগুলোও দেখছিনা। মিছিলে যোগ দিল কি-না কে জানে? কুত্তার জাত। এই আছমা, এদিকে আয় তো।

আছমাঃ কি হয়েছে বাবা?

মন্ত্রীঃ বাইরে কিসের যেন কোলাহল শুনা যাচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছিনা। জনতার 'ঘেরাও' না তো আবার?

আছমাঃ (কান খাড়া করে শুনতে লাগল। হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠে) বাবা, পেছনের গেইটটা এখনও নিরাপদ, গাড়ীতে উঠ, পালাই তাড়াতাড়ি।

(উর্ধ্বশ্বাসে একজনের প্রবেশ)

মন্ত্রীঃ (এগিয়ে গিয়ে) বল্ দুলু শেষ খবর কি?

দুলুঃ (কাঁপতে কাঁপতে) আগেই বলেছি পদত্যাগ করুন। কিন্তু শুনলেন না। জনতা এক কাতারে। সরকারের পতন হয়ে গেছে। এখন জান বাঁচান।

মন্ত্রীঃ (মাটিতেই বসে পড়ে) তাহলে উপায়? পুলিশ, আমি মিলিটারি সবাই নেমকহারামী করল?----

আছমাঃ বাবা তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করুন।

দুলুঃ তাই করুন হুজুর।

মন্ত্রীঃ হ্যাঁ, তোমরা সাক্ষী থাক—আমি সজ্ঞানে জনতার স্বার্থে--দেশের মঙ্গলার্থে পদত্যাগ করলাম—

(জনতা হুড় হুড় করে গেইট দিয়ে ঢুকছে)

মন্ত্রীঃ (ভয়ে) এ কি। ওরা কি চায়? কেন আসছে?

(জনতা আসছেই)

মন্ত্রীঃ (চিৎকার করে) প্রাণপ্রিয় দেশবাসী, আমি তোমাদের সাথে আছি। স্বৈরশাহী থেকে পদত্যাগ করলাম।

জনতাঃ (মন্ত্রীকে দেখে) এই পেয়েছি এক চোরকে। ধর্—মার্---

মন্ত্রীঃ (আরও ভয়ে—হাত জোড় করে) না, আমি পদত্যাগ করেছি। আমি আপনাদের সাথেই----

(কে শুনে কার কথা? কোলাহলে শুধু একটি কথাই বুঝা গেল—'মরণে সবাই তওবা করে'। মঞ্চের আলো ক্রমে নিভে আসবে। জনতা বিজয়োল্লাসে দিগ্বিদিক চলে যাবে।)

ঃ যবনিকা ঃ

সাগরের মুক্তা

মোঃ জেহাদউদ্দিন
কলেজ নং ৫৭২৪
দ্বাদশ মানবিক

অবশেষে ট্রেনে উঠে সাগর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কর্তব্যরত কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে সে 'জ' নম্বর কোচ কোনদিকে জেনে নেয়। কিন্তু নিজের টিকেটের সাথে সীট নাম্বার মিলিয়ে এবং সেই সীটে একজন কিশোরীকে দিব্যি বসে থাকতে দেখে সে থতমত খেয়ে যায়।

ঈদে প্রচণ্ড ভীড় হবে ভেবে আগেই সে টিকেট করে রেখেছিল। তাছাড়া তাকে যেতে হবে অনেক দূরের পথ—ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া। এত দূরের পথ বকের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আগেই সে সীটের ব্যবস্থাটা করে রেখেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য একটা প্রাণীকে সীট জবর দখল করে আছে দেখে প্রথমটায় বিস্মিত হলেও পর-মুহূর্তেই হিম্মত সঞ্চার করে সে এগিয়ে যায়। প্যান্টের পকেট থেকে টিকেটটা বের করে আবার নাম্বারটা মিলিয়ে নেয়। এতো তারই সীট।

মেয়েটি সীটে বসে একমনে বই পড়ছে। বোধহয় কোন নভেল-টভেল হবে। তার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কি না আছে সেইদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। আরেকজনের সীটে যে বসে আছে, সেই সেন্সটুকুও আছে কি-না কে জানে।

অবশেষে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আস্তে একটা কাশি দেয় সাগর। মেয়েটি মুখ তুলে তাকায়। সাগর মাথা নিচু করে ফেলে। মেয়ে-দের সামনে সে কেমন যেন বিব্রতবোধ করে। মাথা নিচু করেই বলে,—

'Excuse me sister—সীটটা সম্ভবত আমার।'

মেয়েটি যেন অসহায়ের মত আরেকবার সাগরের দিকে তাকায়। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলে যায়।

গার্ডের বাঁশির সাথে সাথে ট্রেন ছেড়ে দিল। এতক্ষণের ভ্যাপসা গরমের পর এবার যেন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বাইরে তাকিয়ে থাকে আনমনে। দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত—চিরসবুজ বাংলাদেশের এক চিরন্তন প্রতিবিম্ব। রাখাল গরুর পাল নিয়ে ছুটোছুটি করছে। কৃষক তার রক্ত-মাংসে লালিত জমিগুলোতে কাজ করে যাচ্ছে—দূরে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট এক-খানা নদী—মাঝি নৌকার বাদাম তুলে চলছে হয়তো দূর অজানার পথে। সাগর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে এসব। এসব দেখে দেখে খুব ভালো লাগে তার। যেন এ দেখার শেষ হবে না কোনদিন—এ রূপের আবেদন যেন চিরন্তন। ব্যাগ থেকে সে জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' বের করে। আপন মনে গেয়ে উঠে—

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও,
আমি এই বাংলার পাড়ে রয়ে যাব।

—'সাব, একটা টাকা দিবেন? ঈদ করুম।'—এক ভিখারীর করুণ আর্তিতে সাগরের তন্ময় ভাঙ্গে। পকেট থেকে সে দশটি টাকা দিয়ে দেয়। তারপর কি মনে করে উঠে দাঁড়ায়—করিডোরের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ করে সে পরিচিত একটামুখ দেখে চমকে ওঠে। দেখে, সীটে বসা সেই মেয়েটি মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে।

কি মনে করে সাগর এগিয়ে যায়। মেয়েটি চেয়ে থাকে ওর দিকে। কি সুন্দর চাহনি। চোখের পাতায় কেমন যেন একটা মায়াময় আবেদন। সাগর মাথা নিচু করে ফেলে। সাহস সঞ্চয় করে তবু সে বলে—"এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়ুন—ভাল লাগবে। বাংলা-দেশের প্রাকৃতিক শোভা দেখুন।"

—'বাংলাদেশকে আপনি খুব ভালবাসেন, তাইনা?'—মেয়েটি মুচকি হেসে উত্তর দেয়।

—'ভাল না বাসার কি-ই-বা কারণ থাকতে পারে?'

সাগরের সুন্দর বচনভঙ্গী মেয়েটিকে আকৃষ্ট করে; কি মনে করে জিজ্ঞেস করে—

—'আপনি যাবেন কোথায়?'

—'ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।'

—'আমিও যাব। ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।' —মেয়েটি বলে। সাগরের দিকে সে তাকায়। কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই সরমে লাল হয়ে যায়। সাগর জিজ্ঞেস করে—

—'আপনি বুঝি সীট পাননি?

—'হ্যাঁ তাই।'

—'তাহলে আসুন। আমি দাঁড়িয়েই যেতে পারব। আমার সীটে বসুন।'

—'তা কি হয়? মেয়েটি সহজ ভঙ্গিতে বলে।'

সাগর ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রেন চলছে তার আপন গতিতে। মেয়েটির দিকে তাকাতে তার বড় কষ্ট হচ্ছে। মেয়ে মানুষ এত দূরের পথ দাঁড়িয়ে যাবে কিভাবে? অনেকটা অনুনয়ের সুরেই সে বলে—'যদি জানতাম এভাবে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, তাহলে আপনাকে এভাবে উঠিয়ে দিতাম না। মাফ করবেন প্লীজ।'

মেয়েটি বিস্ময়ভরা চোখে তাকায়। এমন ছেলেও কি হয়? আপন মনেই সে বলে। এদের বয়সী ছেলেরাইতো রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করে। কিংবা এসিড নিক্ষেপ করে। অথচ...

—'আপা আসুন।'

—'আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি। না, তা হয় না। এরচেয়ে বরং দু'জনেই বসি।'

সাগর কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর বলে —'একসাথে বসলে লোকে ভাববে কি?'

—'ভাববে, আমরা ভাই-বোন।'—মেয়েটি ঝটপট উত্তর দেয়।

—'তাহলে চলুন।'

ট্রেন চলছে দ্রুতগতিতে। সামনে আর একটি স্টেশন। তারপরই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

সাগর বাইরের দিকে চেয়ে থাকে আনমনে। সেই সাথে মেয়েটিও। শরতের আকাশ। ভাসমান মেঘখণ্ড এদিক ওদিক ভেসে চলছে। দূরে কাশবনে সাদা ফুল বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। দুইপার্শ্বে সৌন্দর্যের লীলাভূমি একেকটা গ্রাম। —ট্রেন থেকে মনে হয় যেন পেছন দিকে দৌড়াচ্ছে—মানুষ আর মাটির এ যেন চমৎকার লুকোচুরি খেলা। দু'জনেই বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে। মেয়েটি হঠাৎ মুখ খুলে। বলে —'এত বড় একটা উপকার করলেন। কিন্তু এখনও পরিচয়টাই জানা হল না।'

—'ও আচ্ছা'।—সাগর মুচকি হেসে তাকায়। --ডাক নাম 'সাগর'। রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ থেকে এইচ, এস. সি. পরীক্ষা দিলাম।

—'চমৎকার মিল। এখন থেকে তাহলে 'তুমি' সম্বোধন করব। হলিক্রস থেকে এইচ. এস. সি পরীক্ষা দিলাম। ডাক নাম মুক্তা।'

--'নামের মাঝেও সুন্দর মিল'।--সাগর হেসে উঠে।

—'কি রকম?'

--'আহা, সাগর আর মুক্তা--বড় অদ্ভুত মিল এ দুইয়ের মাঝে।'

মুক্তা চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে। তারপর বলে--'বাংলাদেশকে খুব ভালবাস না?'

—'হ্যাঁ'।—সাগর উত্তর দেয়।

—'আমিও।'

কথাবার্তার মধ্যদিয়ে গাড়ি একসময় এসে থামে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া স্টেশনে। আস্তে আস্তে

তারা প্লাটফর্মে নামে।—'আমাদের বাসায় কিন্তু আসবেন'—এই বলে মুক্তা অন্যদিকে চলে গেল।

o o o o

রাত অন্তত ২টার কম হবে না। কিন্তু ঘুম আসছেনা কোন কুমেই। বিছানার মধ্যেই সাগর অস্থির অস্থির করে। একবার চোখ বুজে থাকে অনেকক্ষণ, ঘুম তবু আসে না। উদ্দেশ্যহীন-ভাবে হারিকেনের বাতিটি একবার বাড়ায়, আবার কমায়। বিছানার পাশ থেকে 'Bangla-desh my love' বইটি নিয়ে একসময় জোরে জোরে পড়তে থাকে।

—'এখনও ঘুমাসনি, সাগর?'—পার্শ্বের ঘর হতে মায়ের স্বর ভেসে আসে।

সাগর উঠে দাঁড়ায়। বলে—'অনেকদিন পর বাড়ি আসলাম কি-না, তাই ঘুম আসছে না।'

দরজাটা খুলে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায় সে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, আর অসংখ্য তারা-ফুল। ঝির ঝির বাতাস বইছে। কামিনীর সুমিষ্ট সৌরভে চতুর্দিক মৌ মৌ করছে। বিমুগ্ধ নয়নে সে বাংলার রূপ—মাধুর্য চেয়ে চেয়ে দেখে। আপন মনেই সে গেয়ে উঠে—

"বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি। তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।"

একসময় ভাবে—মুক্তাও তো আমার মতই এদেশকে ভালবাসে। উহ্, আশ্চর্য মিল।

কল্পনার চোখে ভেসে উঠে মুক্তা নামের সেই অবয়বটি—চলার পথে ক্ষণিকের তরে যার সাথে দেখা। অথচ আশ্চর্য, কোনকুমেই সে ভুলতে পারছেনা তাকে। ক্ষণিকের এ স্মৃতিটুকু যেন তাকে নতুন পথের দিকে তাড়িয়ে ফিরছে।

এমনভাবে কতক্ষণ কাটে তার খেয়াল নেই। মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনিতে হঠাৎ যেন সে সম্বিৎ ফিরে পায়। বিছানায় ঘুমের ভান করে সে পড়ে থাকে।

বাইরে বসে সাগর বই পড়ছিল। একটা ছেলে এসে খবর দেয়—'সাগর ভাইয়া, একটা মেয়ে আপনার সাথে দেখা করতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'—সাগর চমকে উঠে—'মুক্তা না তো আবার?' জামাটা পড়ে দ্রুত সে ঐ দিকে যায়। দেখে ছোট্ট একটা মেয়েকে সঙ্গে করে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তা। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে—

—'মুক্তা, তুমি?'

—'হ্যাঁ। আশুগঞ্জ এক বোনের বাড়ি যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, তোমাদের বাড়ি যখন সামনে পড়ল। দেখাটা করেই যাই।'—চল কথা বলি।

সাগর চেয়ে চেয়ে দেখে মুক্তাকে। আজ আরও সুন্দর লাগছে তাকে।

—'কি, বসতে দেবে না?' —মুক্তা হাসে।

সাগর যেন লজ্জায় পড়ে। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে। তারপর বলে—

—'জান মুক্তা সারারাত ঘুমোতে পারিনি।'

—'আমিও।'

—'একটু পরেই তোমাদের ওখানে যেতাম।'

—'আর আমি দেখা করতে চলেই এলাম।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে সাগর কি যেন ভাবে। কেমন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—

—'একটা কথা বলব, মুক্তা?'

—'অবশ্যই।'

—'তুমি এখন চলে যাও। আমি পরে তোমা-দের ওখানে আসব। জান মুক্তা, গ্রামের পরিবেশ এখনও ওরকম যে কেউ এভাবে কথা বলতে দেখলে পরমুহূর্তেই গ্রামকে গ্রাম রাষ্ট্র করে বেড়াবে যে, অমুকের ছেলে তমুক মেয়েমানুষকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে।

—'তাই নাকি?'—মুক্তা চোখ বড় বড় করে তাকায় সাগরের দিকে। তারপর বলে—

—'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে। অনেক কথা আছে।'

এক-পা দু-পা করে মুক্তা চলে যায়। সাগর চেয়ে থাকে তার পথ পানে।

সূর্য তখন পাটে নেমেছে। দখিন হাওয়া গাছগাছালিতে দোলা দিয়ে যায়। পাখ-পাখালি কিচির মিচির করছে। বাগানে ফুল ফুটেছে হরেক রকম। মুক্তার নিজের হাতে গড়া এ বাগান। ফুলকে সে বড় বেশি ভালবাসে। তাই ঢাকা থেকে আসলে বাগানেই তাকে দেখা যায় বেশি সময়। আপন হাতে গড়া এ বাগানে দাঁড়ালে পৃথিবীটাকে মনে হয় অনেক সুন্দর, পাপ-পংকিলতার উর্ধে সে একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে।

বাগানের সামনে আনমনে সে দাঁড়িয়ে থাকে। মনটা কেমন যেন অস্থির অস্থির করছে। সেই কবে সাগরের আসার কথা। এখনও আসছেনা কেন?

একটি ফুল সে হাতে নেয়, গন্ধ শুঁকে। কি মনে করে ভেতর বাড়িতে যায়, আবার আসে, আবার যায়। 'সারেং বউটি' হাতে নেয়। একটু পড়ে, আবার রাখে। এমনি করতে করতে কখন তার চোখ বুঁজে আসে। একটি সুমিষ্ট আওয়াজে ধড়ফড় করে সে উঠে বসে।
—'মুক্তা আছে বাসায়?'

মুক্তা একলাফে ছুটে আসে বাইরে। আহলাদে বলে উঠে—'আরে সাগর যে। তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। ভেতরে আস।'

—'তোমার মা-বাবা কিছু মনে করবে না?'

—'না, একদম না।'

মুক্তা সাগরকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে পাশাপাশি বসে। সুন্দর পরিপাটি রুম। সবকিছু চমৎকার সাজানো গুছানো। মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে কয়েকটি তৈলচিত্র শোভা পাচ্ছে। সম্মুখভাগে জাতীয় স্মৃতিসৌধের চমৎকার প্রতিচ্ছবি—একাত্তরের শহীদদের স্মরণে নির্মিত এ সৌধ। সাগর তন্ময় হয়ে এটি দেখে আর ভাবে।

মুক্তা পাশেই বসা ছিল। সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে—'কি দেখছ অমন করে?'

—'স্মৃতিসৌধটা দেখছি। আর ভাবছি—একটি ফুলকে বাঁচাবে বলে, তাঁরা যে যুদ্ধ করেছে, যেভাবে সর্বস্ব বিলিয়ে গেছে, তাদের সেই ত্যাগের কতটুকু মূল্য আমরা দিতে পেরেছি?'

—'আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, সাগর। কি হবে এ দেশটার?'

এমন সময় শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত এক ভদ্রলোক জামাটা গায়ে দিতে দিতে রুমের দিকে আসেন। মুক্তা পরিচয় করিয়ে দেয়—'আমার বাবা।'
—সাগর উঠে সালাম দেয়।

ভদ্রলোক সাগরকে কাছে নিয়ে বসতে বসতে বলেন—'মুক্তার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি। দোয়া করি মানুষ হও। আদম সন্তান গিনিপিগের মত কিলবিল করলেও সত্যিকার মানুষের বড় অভাব এই দেশে।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান। মুক্তাকে বলেন—'তোরা কথা বল। আর সাগরকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিস্‌না।'

মুক্তা বুয়াকে ডাক দেয়—'চা নাস্তা দিয়ে যাও।'

তারপর আবার তারা গল্পে মেতে উঠে। সাগর ঘড়ির দিকে তাকায়। চমকে উঠে—

—'একি, পাঁচটা বেজে গেছে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।'

—'চলেই যখন যাবে, তবে আসলে কেন?'—মুক্তা মুখ ভার করে বসে থাকে।

সাগর অগত্যা বসে। বাইরের দিকে সে তাকায়। আপন মনে বলতে থাকে—'এত সুন্দর ফুল তোমার বাগানে?'

—'এই নাও'—বলে মুক্তা তার স্কার্টের পকেট থেকে একটি লাল গোলাপের কুঁড়ি এগিয়ে দেয়।

নিজের অজান্তেই যেন সাগর হাত বাড়িয়ে দেয়। একদৃষ্টে দেখে তাকে। যেন কোন মানবী নয়, স্বর্গের অপ্সরী।

মুক্তাও চেয়ে চেয়ে দেখে তাকে। কতক্ষণ এভাবে কাটে কে জানে। মুক্তা বলে—

—'জান সাগর, তোমার জন্য সেই দুপুর থেকে ফুলটি রেখে দিয়েছি।'

সাগর ফুলটি হাতে নেয়। চেয়ে চেয়ে দেখে। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবে, আর বলে—'বড় সুন্দর এ ফুল। তবে এর চেয়ে আরও সুন্দর তুমি।'

মুক্তা মাথা নিচু করে ফেলে। কিছুক্ষণ পর বলে—

—'বাগানে যাবে, চল।'

বিকেলের মিষ্টি হাওয়া, আর সেই সাথে ফুলের সৌরভ, কাছেই আমগাছটিতে দোয়েলের একটানা মিষ্টি গান—সব মিলিয়ে চমৎকার লাগছে।

সাগর একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাগানের দিকে। মুক্তা বলে—

—'সাগর, এ বাগানে দাঁড়ালেই হৃদয়ে বাজে মোহিতলাল মজুমদারের সেই সুর—

"এই বাংলার তৃণে তৃণে ফুল, কুলে কুলে মধুমতি
শ্যামলে-সবুজে ধূলামাটি ঢাকা আলোকের আলিপনা।"

সাগর বলে—'বড় সুন্দর এই দেশ। প্রকৃতির দিকে তাকালে ইচ্ছে করে এর পরতে পরতে মিশে যায়, এদেশের আকাশ এদেশের বাতাস মন-প্রাণ উদাস-আকুল করে তুলে।'

—'তবে আরও সুন্দর তুমি, তোমরা, এদেশের মানুষেরা।'

—'সত্যি বলছ মুক্তা?'

—'সত্যি, সত্যি—একদম তিন সত্যি। আচ্ছা একটা কথার জবাব দেবে, সাগর?'

—'কি?'

—'সেইদিন থেকে আমার এমন হল কেন? কেমন যেন লাগছে। তোমার সাথে ক্ষণিকের পরিচয়ে পৃথিবীটাকে মনে হচ্ছে অনেক সুন্দর, অনেক আপন। আচ্ছা সাগর, এমন হয় না, ক্ষণিকের পরিচয় চিরদিনের পরিচয়ের ভিত্তি হয়ে থাকুক?'

—'অমন করে কথা বলছ কেন, মুক্তা? তাছাড়া আমার আর তোমার স্বভাবতো মিলবে না কোনদিন।'

—'কেন, সাগর?'

—'না, আমি বলছিলাম কি. . .একজনকে ভালবাসার অর্থ হল তার মত জীবন-যাপন করা।'

—'আমি পারব সাগর—তোমার আদর্শে আমি চলতে পারব সারাটি জীবন।'

মুক্তার আকুতিভরা কণ্ঠে সাগর চমকে ওঠে। কিসের যেন একটা ঢেউ খেলে যায় হৃদয়ের মাঝে। হঠাৎ যেন হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায় নতুন জগতের অন্বেষায়। নিজের অজান্তেই মুক্তার হাতটি চেপে ধরে। আবেগভরা কণ্ঠে বলে—'তুমি পারবে মুক্তা একজন রোকেয়া হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে, একজন আদর্শ মহিষী হয়ে আর সবাইকে আলোর পথে আনতে?'

—'পারব ইনশাল্লাহ। বিশ্বাস কর, সাগর জীবনে এই প্রথম কোন ছেলেকে আমার এমন ভাল লেগেছে—আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

মুক্তা থামে। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে। তারপর বলে—

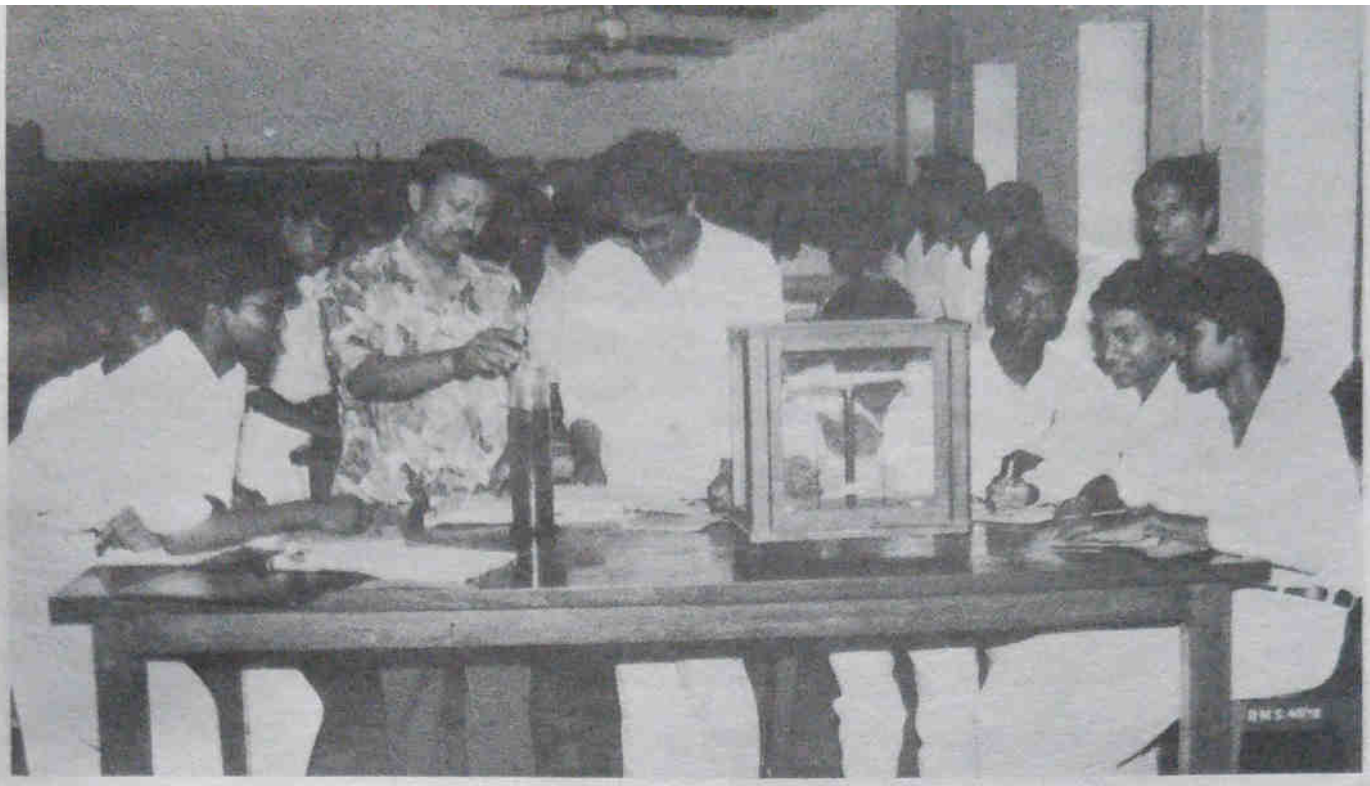

কলেজ ফিজিক্স ল্যাবরেটরীতে ছাত্রবৃন্দ

কলেজ কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরীতে ছাত্রবৃন্দ

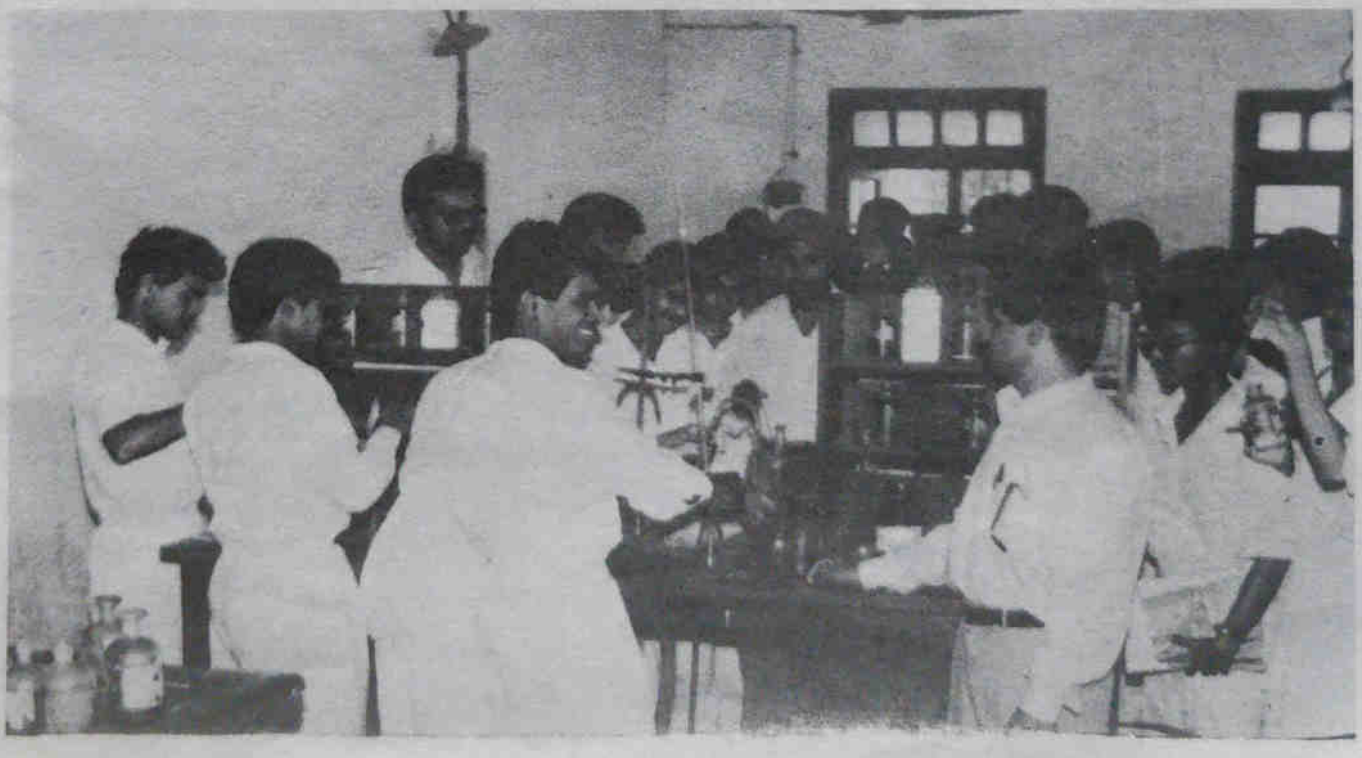

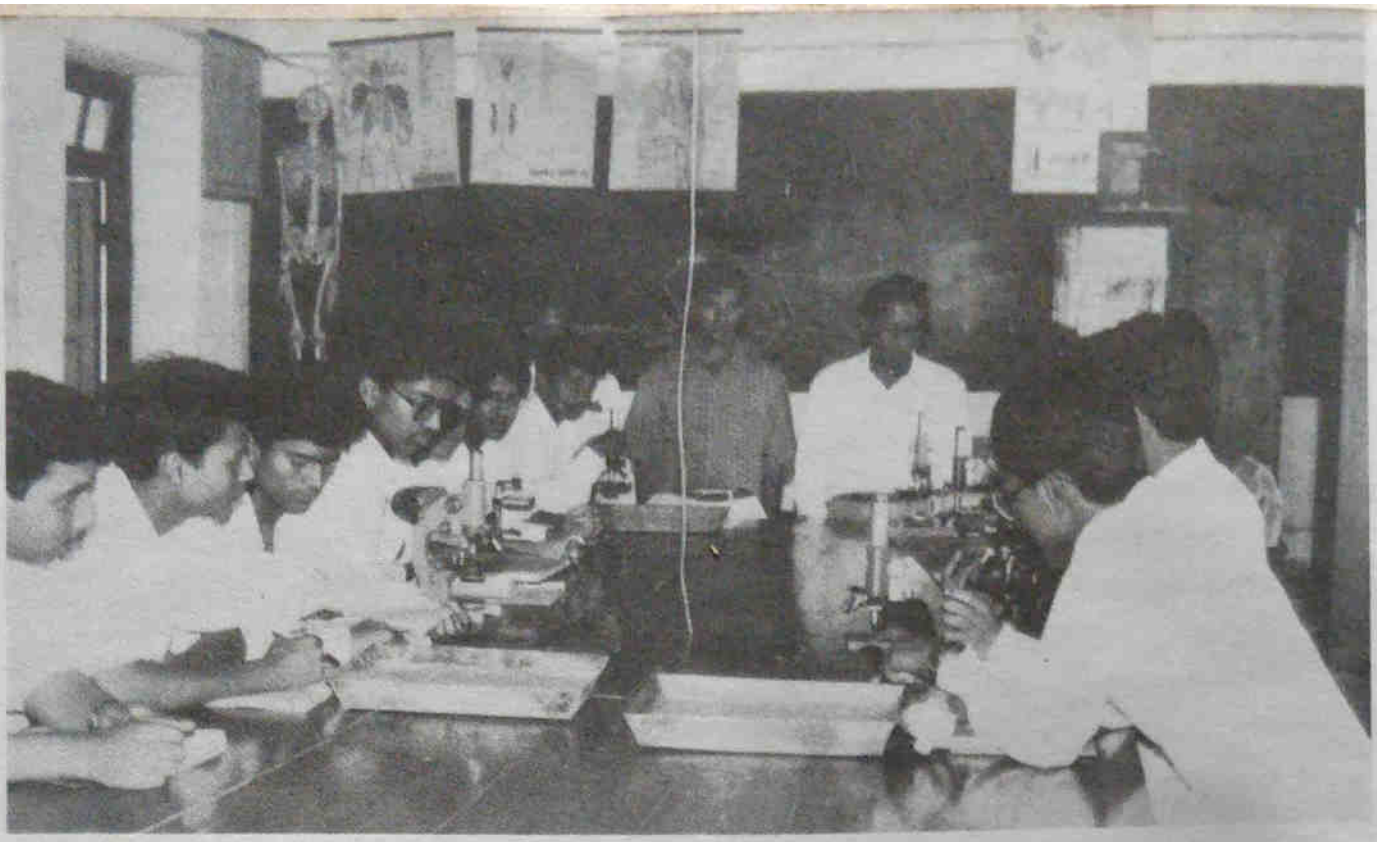

কলেজের বায়োলজী ল্যাবরেটরীতে ছাত্রবৃন্দ

ভূগোল ল্যাবরেটরীতে ছাত্রবৃন্দ

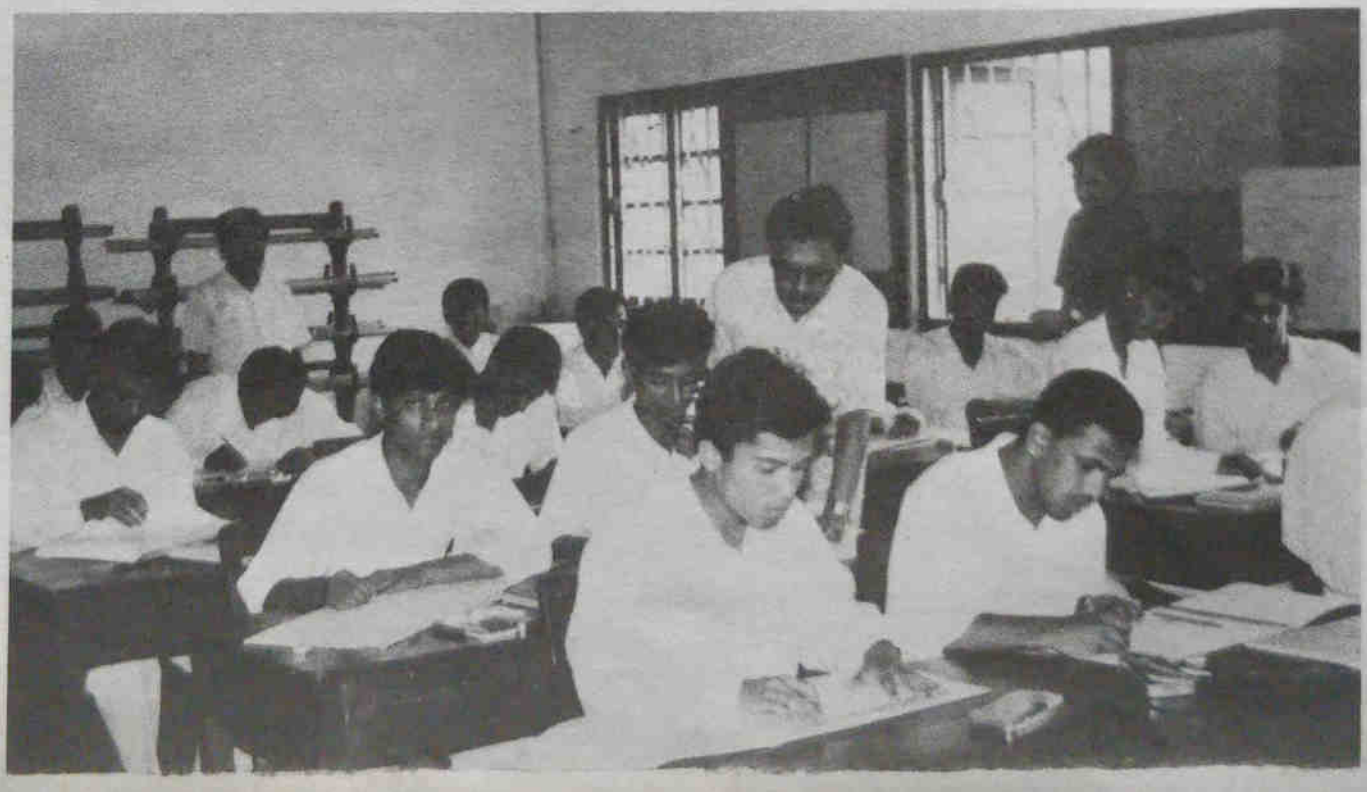

কলেজ পাঠাগারে পাঠরত ছাত্রবৃন্দ

কলেজের প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে ডাক্তার ফার্মাসিস্টগণ এবং অসুস্থ ছাত্রবৃন্দ

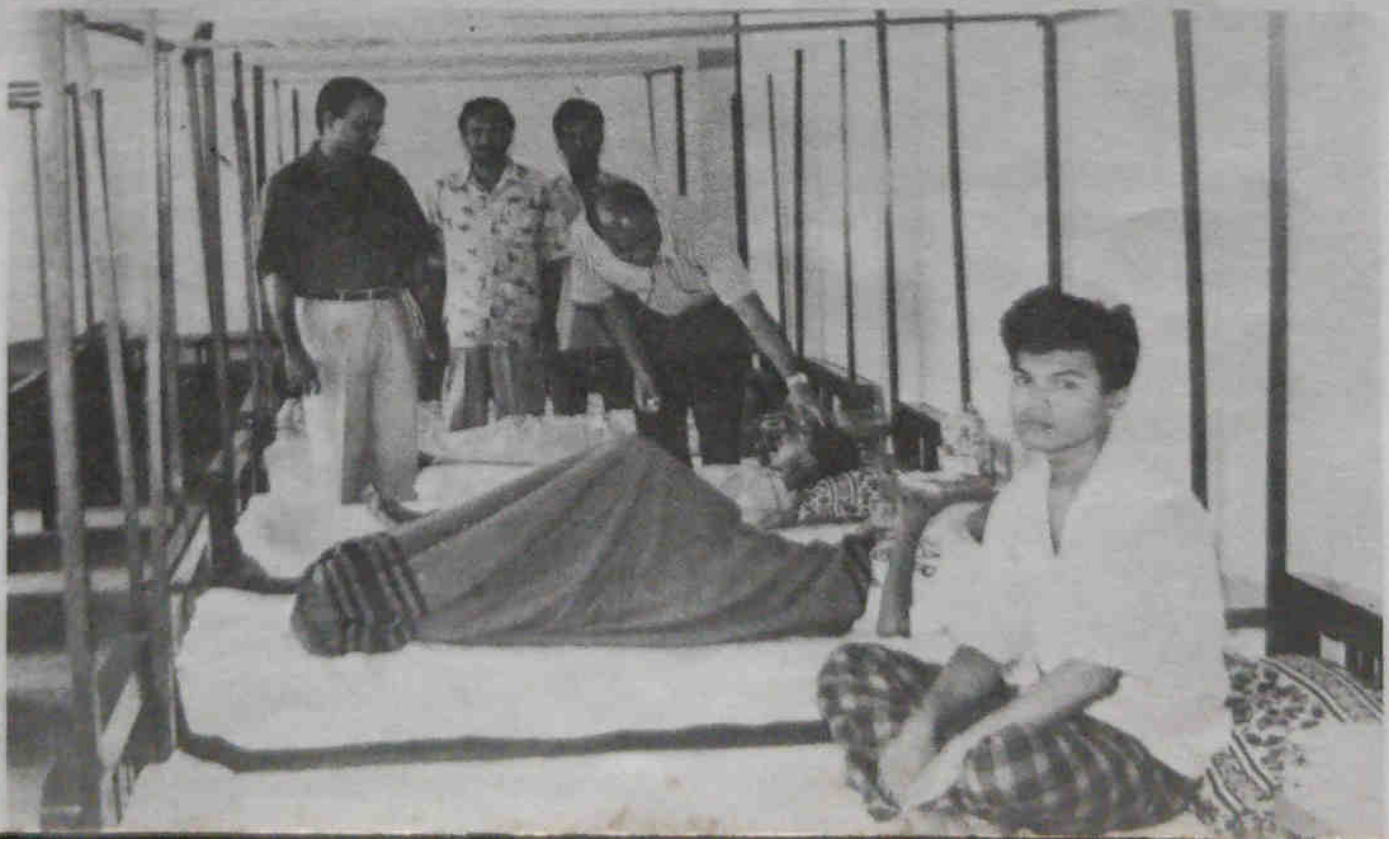

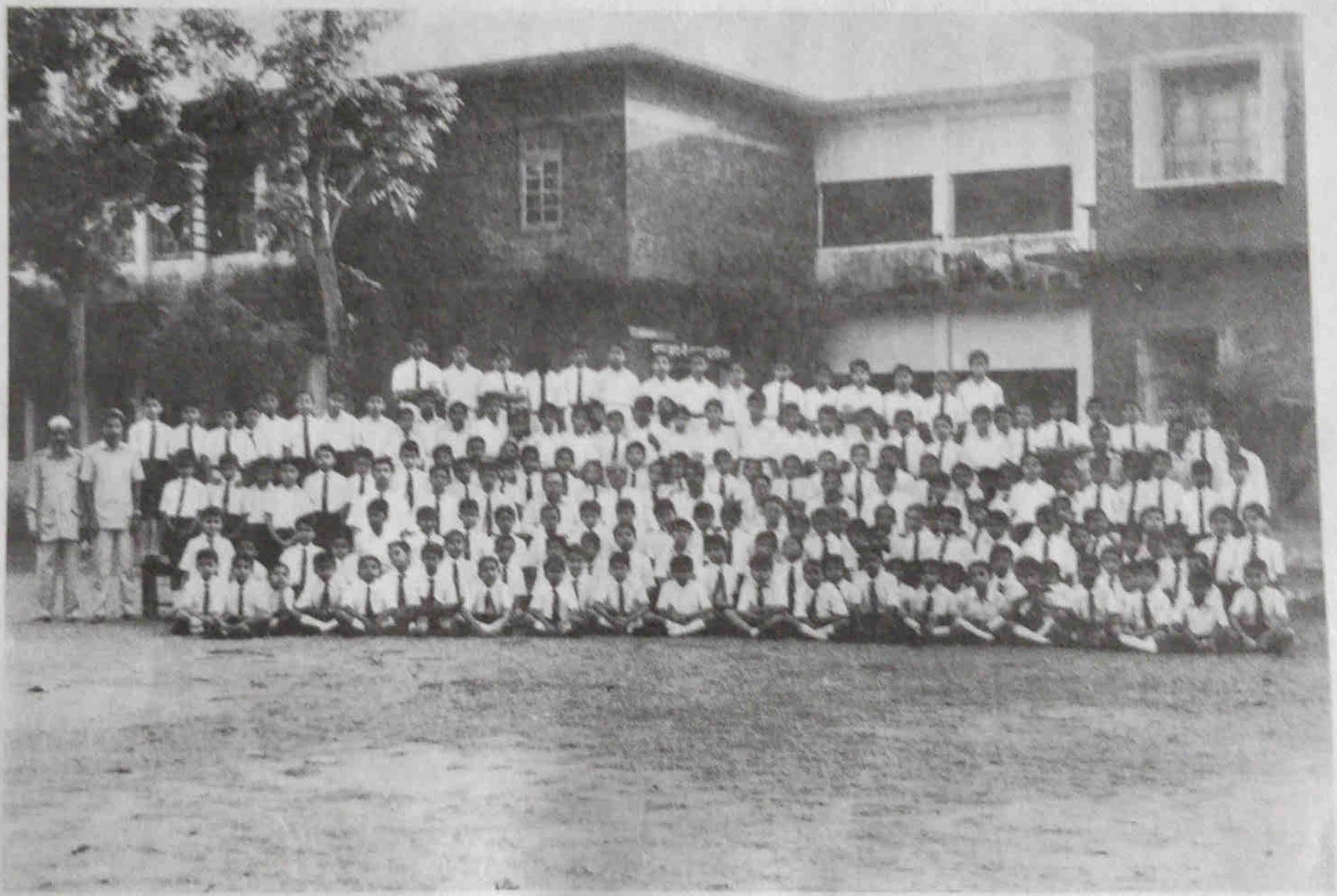

কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রবৃন্দ, হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও
মেট্রনের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (জুঃ)

জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্রবৃন্দ, হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও
মেট্রনের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (জঃ)

ফজলুল হক হাউসের ছাত্রবৃন্দ, হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও
অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রবৃন্দ, হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও
অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

লালন শাহ্ হাউসের ছাত্রবৃন্দ, হাউস মাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের
সাথে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

—'আর এমনতো কথা নয় যে, আমি ভালবাসি বলেই তোমাকেও ভালবাসতে হবে। সেইদিন ট্রেনে তোমার যে মূর্তি আমি দেখেছি, আপন মনের মাধুরী দিয়ে সেই মূর্তির পূজা করে যাব দিনের পর দিন।'

সাগর কান পেতে শুনে আর ভাবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাখিরা ফিরছে যার যার বাসায়। সাগর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে আর বলে—

—'বড় ভালবাসি এ দেশকে।'

—'আমিও বড় ভালবাসি এদেশকে, এদেশের মানুষকে, বিশেষ করে তোমাকে, সাগর।

সাগর মুক্তার দিকে তাকায়। চমকে ওঠে—

—'একি, তোমার চোখে পানি, মুক্তা?'

মুক্তা চোখ মুছে ফেলে। বলে—'কৈ, নাতো!'

সাগর মুক্তাকে জড়িয়ে ধরে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে—'মুক্তা, আমরা দু'জনেই ভালবাসি এদেশকে, এদেশের মানুষকে।'

মুক্তা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সাগরের দিকে। আকুলকণ্ঠে বলে—'শুধু মুক্তা বলোনা সাগর। বল, "সাগরের মুক্তা"। অন্তত একটি বার হলেও।'

অদূরেই পাখির যুগল গান গেয়ে উঠে। সাগর নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মুক্তার দিকে। অস্ফুটস্বরে বলে—'সত্যি তুমি সাগরেরই মুক্তা। চল ঘরে ফিরি।'

রাতের গাঁয়

গোলাম কিবরিয়া জুয়েল

কলেজ নং ৪১৭৯

দশম বিজ্ঞান

রাতের বেলা আকাশ আমায়
চুপটি করে ডাকে,
পদ্মা ফোঁটা, শিশির পড়া
রসুল পুরের বাঁকে।

শান্ত নিবিড় শ্যামল বনে
গাছের শীতল ছায়া
আপন মনে কে সে ভাই
ছড়িয়ে দিলো মায়া।

জুঁই, জবা আর হাসনাহেনার
সুবাস ভরা ফুলে
উপ্‌ছে পড়ে ঢেউগুলো সব
ছন্দে, নদীর কূলে।

চাঁদটা যেন হাত বাড়িয়ে
হাসছে মধুর হাসি,
তাইতো সবাই দেশকে এতো
দারুন ভালবাসি।

ধাঁ ধাঁ

সংগ্রহঃ স্বনার্ভ বনিক

কলেজ নং ৫৭৬৩

চতুর্থ শ্রেণী

তিন অক্ষরে নাম যার গৃহমধ্যে রয়,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে খাদ্যবস্তু হয়,
শেষের অক্ষরটিকে বাদ দিলে পরে
বিষাক্ত এক প্রাণীর নাম হয়ে পড়ে।

উঃ বিছান।

সংগ্রহঃ হাফিজুর রহমান

কলেজ নং ৫৮৪৩

চতুর্থ শ্রেণী

জন্মে সাদা, কর্মে কালা গলায় লোহার হার
লাফ দিয়ে আহার খোঁজে লম্বা লেজ তার।

উত্তরঃ জাল

কম্পিউটার ভাইরাসের কথা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান
কলেজ নং ৪৭৩৩
একাদশ বিজ্ঞান

I am the Emperor of the world,
I can kill anybody, but nobody can kill me,
If I have to proove who am I,
I have to die
HA ! HAH !! HAAH !!!

এবং এরপর কম্পিউটারের মনিটরে শুরু হবে অগুনিত রঙের ছোড়াছুড়ি। সবশেষে জ্বালিয়ে দিবে কালার মনিটরের ক্যাথোড রে টিউবটিকে। হ্যাঁ, এটিই হল সাম্প্রতিকতম ও আধুনিকতম একটি কম্পিউটার ভাইরাসের প্রকৃতি—যার নাম "Bomb Shell"। কম্পিউটারের সংস্পর্শে যারা এসেছেন কমবেশী সবাই কোন-না-কোন ভাইরাস ঘটিত বিড়ম্বনার শিকার। আর বাদ-বাকীরা অন্তত একবার হলেও কম্পিউটার ভাই-রাসের নাম শুনেছেন। একই সঙ্গে প্রোথিত হয়েছে কম্পিউটার ভাইরাসকে ঘিরে নানা ধারণা---নানা কল্পনা।

কম্পিউটার ভাইরাস সম্বন্ধে জানতে হলে, গোঁড়াতেই তিনটি বিষয়ে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ হার্ডওয়্যার (কম্পিউটারের গঠন), দ্বিতীয়তঃ সফ্টওয়্যার (কম্পিউটারের কার্য-প্রণালী) এবং তৃতীয়ত প্রোগ্রাম (স্বতন্ত্র একটি সম্পাদন-বিধি) আপনার হাতের Digital ঘড়িটিকে একটি কম্পিউটার হিসেবে বিবেচনা করে, এর সুইচ, ক্রিস্টাল বোর্ড ও যন্ত্রাংশকে হার্ডওয়্যার এবং তারিখ, এ্যালার্ম ও সময় প্রদর্শনের ক্ষমতাকে সামগ্রিকভাবে সফ্টওয়্যার হিসাবে ধরে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে, প্রোগ্রাম হল সফ্টওয়্যার-এর অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র Logical Design; যেমনঃ তারিখ বা সময় প্রদর্শন।

কয়েকটি দুষ্ট গুণের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি দুষ্ট প্রোগ্রামই হল কম্পিউটার ভাইরাস। অন্যান্য আট-দশটি প্রোগ্রামের সাথে এর পার্থক্য হল, কোন প্রকার নির্দেশ ছাড়াই, অন্য কোন মূল প্রোগ্রামের ছত্রচ্ছায়ায় এটি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে মূলতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথমতঃ অতিদ্রুত প্রতিলিপি তৈরি করা। যে ব্যক্তি এই ভাইরাসের রচয়িতা, তার হাত ধরেই এই প্রক্রিয়ার যাত্রা। সাধারণতঃ উৎসস্থল হতে ফ্লপি ডিস্ক (অডিও ক্যাসেটের মত পরিবহনযোগ্য কাগজ সদৃশ তথ্যধারক)-এর মাধ্যমে এক কম্পিউটার হাত অন্য কম্পিউটারে সম্প্রসারিত হয়। এই ভাইরাসগুলো সাধারণতঃ নানা ধরনের কম্পিউটার গেমকে আশ্রয় করে ফ্লপি-ডিস্কের মাধ্যমে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হল টেলি কম্যুনিকেশনের সহায়তায়, কোন প্রকার প্রত্যক্ষ মাধ্যম (যেমন, অপটিক ফাইবার, ইলেকট্রিক কেবল) ছাড়াই এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে যেতে পারে এই ভাইরাস। এভাবে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাধীন হাজার-হাজার কম্পিউটার অতি সহজেই আক্রান্ত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের ক্ষতিসাধন করা। ব্যক্তিগত কম্পিউটার ছাড়াও, কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অন্তর্গত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও বৃহৎ কোম্পানীর কম্পিউটারকে আক্রমণ করে এতে সংরক্ষিত অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, উপাত্ত ও দুর্মূল্য প্রোগ্রামকে অতি অল্প সময়ে বেমালুম লোপাট করে দিতে পারে এই ভাইরাস। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রিয়াশীল হওয়া, রসাল ঘটনার অবতারণা করা কিংবা বিভিন্ন প্রোগ্রামের নাম পরিবর্তন করে দেওয়াও এর পক্ষে অসম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ নিজেকে লুকিয়ে রাখা এবং কোন প্রকার নির্দেশ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হওয়া। ভাইরাস প্রোগ্রামগুলো মূল প্রোগ্রামের আড়ালে থেকে এর এমন ক্ষতি করে যে, ভাইরাসকে আক্রান্ত প্রোগ্রাম হতে সহজে পৃথক করা সম্ভব হয় না।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই এটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট হয়েছে যে, জীবদেহের ভাইরাসের মত এর কোন বায়োলজিক্যাল লাইফ ফর্ম নেই এবং কম্পিউটার বন্ধ থাকলে এই দুষ্ট প্রোগ্রাম-গুলোও নিষ্ক্রিয় থাকে। কম্পিউটার ভাইরাসের কোন অবয়ব নেই—আছে শুধু অস্তিত্ব। এই দুই ধরনের ভাইরাসের মধ্যে যে সাদৃশ্য, তা' শুধুমাত্র দ্রুতসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরিমেয় ক্ষতি করার ক্ষমতাকে ঘিরে।

১৯৪৯ সালের কথা। কয়েকজন বিদগ্ধ কম্পিউটার বিজ্ঞানী নিতান্ত কৌতূহলের বশে এমন একটি প্রোগ্রামের নক্‌শা তৈরী করেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিলিপি গঠন করে হোস্ট-প্রোগ্রামের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু, এই নক্‌শা যে একটি নীল-নক্‌শা ছাড়া কিছুই নয়, তা' প্রমাণিত হয় '৮০ দশকে। ১৯৮০ সালে দুই পাকিস্তানী সহোদর, আমজাদ ফারুক আলভী ও বাসিত ফারুক আলভী, নিজের হাতে তৈরী একটি ভাইরাস প্রোগ্রামকে ফ্লপি ডিস্কে ভরে, নিজস্ব সফ্‌টওয়্যার-এর দোকানের সহায়-তায় সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের অবতারণা করেন। এই ভাইরাসের নাম রাখা হয়েছে "Pakistan-Brain"।

১৯৮৮ সালে কর্নেল ইউনিভার্সিটির এক গ্রাজুয়েট ছাত্র, "ইন্টারনেট" (একটি অতি-বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক)-এ "Unix" নামক একটি ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নানা বিশ্ববিদ্যালয়, NASA, পেন্টাগন প্রভৃতি সংস্থাকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। অবশ্য, এজন্য তাকে ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার ডলার জরিমানা দিতে হয়েছে।

"Friday the 13th" এমন একটি ভাইরাস যা "১৩ তারিখ শুক্রবার"---এমনদিনে কাজ করে আক্রান্ত কম্পিউটারের সমস্ত তথ্যকে মুছে দিতে পারে। এমন একটি ভয়াবহ দিন ছিল ১৯৮৯ সালের ১৩ই অক্টোবর।

"Michelangelo"--এই ভাইরাসটি প্রতি বছর রোমান শিল্পী মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর জন্ম-দিন, ৫ই মার্চ রাত ১২টা ১ মিনিটে (অর্থাৎ ৬ই মার্চ)-এ কার্যকরী হয়।

বাহারী নাম ও বৈচিত্র্যময় ক্ষমতার অধি-কারী ১০০০টি ভাইরাস এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিছু Anti virus প্রোগ্রামও তৈরী হয়েছে। তবে এদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। কম্পিউটারের মত একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে কম্পিউটার ভাইরাস-এর আগমন একদিকে যেমন অর্থগত ক্ষতির সৃষ্টি করছে অন্যদিকে মেধার অপচয় হচ্ছে লাগাম-হীনভাবে। এইদিকটি বিবেচনা করে, যুক্তরাজ্যে গৃহীত এক জরিপের রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"গড় কম্পিউটার অপরাধী একজন পুরুষ, ২৯ বছর বয়স্ক, কম্পিউটিং-এ তার দক্ষতা উচ্চমানের এবং অন্য কোন অপরাধে তার কোন রেকর্ড নেই। তার নিয়োগকর্তার কাছে সে সৎ, বিশ্বাসী, উজ্জ্বল এবং কর্ম পাগল। সে মনে করে কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করা খুবই অন্যায় তবে কোম্পানীর ক্ষতি করা অন্যায় নয়।"

মহাবিশ্বের কথা

শাহ নেওয়াজ খান
কলেজ নং ৩৬৬৫
দশম বিজ্ঞান

আমাদের এই পৃথিবীর চতুর্দিকে অসীম মহাকাশ বিস্তৃত। এই সীমাহীন আকাশে দিবা-ভাগে সূর্য এবং রাত্রিতে চন্দ্রসহ অসংখ্য আলোকবিন্দু দেখা যায়। এগুলোর নাম জ্যোতিষ্ক। আমাদের এই পৃথিবীও মহাকাশের একটি জ্যোতিষ্ক। জ্যোতিষ্ক সাধারণত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত—নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ এবং উল্কাপিণ্ড।

মহাকাশের বিস্তৃতি

এই মহাকাশ আয়তনে খুব বড়। প্রায় ১৩ লাখ পৃথিবীকে একত্রিত করলে হবে একটি সূর্যের সমান মাত্র। সূর্য হচ্ছে একটি নক্ষত্র। কোন কোন নক্ষত্র এত বড় যে ৩৯০০ কোটি পৃথিবীকে ঐ নক্ষত্রের মধ্যে ভরে রাখা যাবে। একেকটা নক্ষত্রের চারিদিকে বেশ কয়েকটা উপগ্রহ-গ্রহ রয়েছে। কোন কোন গ্রহ এই পৃথিবীর সমান, কোনটা ছোট আবার কোনটা বড়। এইসব গ্রহ-উপগ্রহ নিয়েই আমাদের সৌরজগৎ। সৌরজগতে এই জিনিসগুলো ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করে না। (একেকটা গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)। মহাকাশে এরকম একটা সৌর-জগৎ নয়, কোটি কোটি সৌরজগৎ অবস্থিত। কোটি কোটি সৌরজগৎ নিয়ে এক-একটি ছায়াপথ গঠিত। আবার ছায়াপথও এক-দুটি নয়, কোটি কোটি ছায়াপথ ঘুরে বেড়াচ্ছে এই মহাকাশে। এই অকল্পনীয় বড় বড় এক-একটি ছায়াপথ—এরকম কোটি কোটি ছায়াপথ মহাকাশে ভেসে চলছে কোটি কোটি বছর ধরে। অথচ পথের শেষ নেই। হয়ত আরও কোটি কোটি বছর ধরে এগুলো চলবে। কিন্তু পথের শেষ হবে না কোনদিন। এই বিশাল মহাবিশ্বকে 'গজ ফিতা' বা মিটার দিয়ে মাপা যায় না। একে মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা সবাই মিলে একটি নতুন মাপের একক—আবিষ্কার করেছেন। তা হলো "আলোক বর্ষ" বা "Light Years."

মহাবিশ্ব হল কেমন করে

বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রায় ৬ শত কোটি বছর আগে কোন এক সময় এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করে। আর এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে মতবাদটি আজ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা হল "মহাবিস্ফোরণ বাদ"। এই মতবাদের মূলকথা হল মহাবিশ্ব প্রথমে একটা প্রকাণ্ড পিণ্ডের মত দানা বেঁধে ছিল। পিণ্ডটার ব্যাস ছিল কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি মাইল। তারপর একদিন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেই পিণ্ড ভেঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট টুকরা হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই রকম একটা টুকরা হলো আমাদের পৃথিবী। ক্রমশঃ এই টুকরাগুলো ভীষণ বেগে মহাশূন্যের চারিদিকে ছুটতে লাগল। আর এভাবে তাদের দূরত্ব বাড়তে লাগল। বিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে এই কাণ্ডটা ঘটে আজ থেকে প্রায় এক হাজার কিংবা দুই হাজার কোটি বছর আগে।

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদি

সূর্য যেমন মহাকাশে অজানার পথে ছুটে চলছে তেমনি পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপ-গ্রহও একইভাবে ছুটে চলছে। এরপরও বিভিন্ন-গ্রহ সূর্যের—চারিদিকে একটা নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলেছে। আবার কোন কোন গ্রহের চারিপাশে অনবরত প্রদক্ষিণ করছে উপগ্রহ। এগুলো

ছাড়াও রয়েছে গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কা ইত্যাদি। এইসব কিছু নিয়েই হল সৌরজগৎ—সূর্যের পরিবার।

সূর্যের এই জগতে রয়েছে মোট ১০টি গ্রহ। গ্রহগুলো হল—বুধ (Mercury), শুক্র (Venus) পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupitar), শনি (Saturn), ইওরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune), প্লুটো (Pluto) এবং ভাল্‌কান (Vulcan)। এদের মধ্যে বুধ সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ এবং ভাল্‌কান সবচেয়ে দুরবর্তী গ্রহ। বৃহস্পতি সবচেয়ে বড় গ্রহ বলে একে "গ্রহরাজ" বলে।

জ্যোতিবিজ্ঞানীগণ বহুদিন ধরে গবেষণা করে জানতে পেরেছেন যে, যেসব আলোক-বিন্দুকে আমরা নক্ষত্র বলে মনে করি তার সবগুলোই আসলে নক্ষত্র নয়। তাদের অনেক-গুলোই এক-একটি নীহারিকা বা নেবুলা। আকাশের কোন কোণে যদি অনেকগুলো নক্ষত্র খুব ঘেঁষাঘেষি করে থাকে তাহলে দূর থেকে তাদেরকেও উজ্জ্বল মেঘের মত মনে হতে পারে। কিন্তু কোন বড় দুরবীণের পাল্লায় পড়লে তাদের আসল চেহারা ধরা পড়ে যায়। তাই জ্যোতি-বিজ্ঞানীদের পক্ষে নক্ষত্র আর নীহারিকার পার্থক্য বুঝে নেওয়া খুব কঠিন নয়।

মহাকাশের সংঘর্ষ

মহাকাশের নক্ষত্রাদি দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে যদি দুইটি নক্ষত্রের মধ্যে ধাক্কা লেগে যায়, তাহলে দুটি নক্ষত্রই ভেঙ্গে যায়। আর সেই সংঘর্ষে যে তাপ আর আগুনের সৃষ্টি হয় তাতে সেই ভাঙ্গা নক্ষত্রের দেহ জ্বলেপুড়ে পরিবর্তিত হয় এক জ্বলন্ত-গ্যাসের পিণ্ডে। তারপর সেই গ্যাসের পিণ্ড আকাশের মহারাজ্য জুড়ে অনবরত জ্বলতে থাকে শতাব্দির পর—শতাব্দি ধরে।

বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত

মহাশূন্যের বিভিন্ন গ্রহের গতি প্রকৃতি ও বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাপার একরকম। গ্রহের এইরকম চালচলন ও আরো খুঁটিনাটি ব্যাপার লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হতে পারে যে গ্রহগুলো আসলে সূর্য থেকে তৈরি। এতদিন এ নিয়ে কেউ তেমন তর্ক তোলেনি। তবে কিছু কিছু বিজ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নিম্নে কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতের মতামত তুলে ধরা হল—

১। লা প্লাসের মতামত
২। জেম্‌স জীন্‌সের মতামত
৩। নতুন মত

লা প্লাসের মতামত

লা প্লাস ছিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী। তাঁর মতে সূর্য যখন নীহারিকা থেকে জমাট বেঁধে ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগল তখন তার দেহও স্বাভাবিকভাবেই কুঁচকে ছোট হতে লাগল। আর প্রায় সাথে সাথেই সূর্যের কিছু অংশ ছিটকে গিয়ে ঝরে পড়তে লাগল। ঝরে পড়া অংশগুলোর চেহারা অনেকটা আংটির মত। কিন্তু ঝরে পড়লেও সূর্যের টান থেকে রেহাই নেই। তাই সেই জ্বলন্ত আংটিগুলো তখন সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল। পরবর্তীতে এই আংটিগুলো ক্রমে শীতল হয়ে গ্রহে পরিণত হল।

জেম্‌স জীন্‌সের মতামত

এরপর বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জেম্‌স জীন্‌স এই বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে নক্ষত্রের টানে সূর্যের খানিকটা অংশ দুদিক—দিয়ে বেরিয়ে না এসে একদিক দিয়ে বের হয়। আর সেই জিনিসটা টর্পেডের মত।

পরে সেই—টর্পেডটিই ভেঙ্গে টুকরা হয়ে জমাট বেঁধে এবং আরো বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে নানাগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে।

নতুন মত

জেম্‌স জীন্‌সের মতবাদের সাথে আবার অনেক বিজ্ঞানী একমত হতে পারেননি। তাই দেখা দিল নতুন মতবাদ। নতুন মতের একটি জার্মান বিজ্ঞানী ভাইৎস্‌স্যাকারের, অপরটি রুশ বিজ্ঞানী অটো স্মীথের। এদের দু'জনেরই মত হল, সূর্য থেকে নয়, মহাকাশে ভাসমান এক—বিরাট ধূলি পুঞ্জ ও গ্যাসের মেঘ থেকেই জন্ম হয়েছে গ্রহদের। স্মীথের মতে সূর্য নিজে যখন গড়ে উঠেছিল তখন তার কাছেই ছিল এই ধূলিপুঞ্জ ও গ্যাসের মেঘ। এরপর সূর্যের আকর্ষণেই ঐ ধূলোর কণা আর মেঘের মধ্যে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি হতে হতে সেগুলো দানা বাঁধতে শুরু করল আর এই আকর্ষণেই তারা সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে লাগল। এভাবে ক্রমাগত সেগুলোই আরও জমাট বেঁধে সৃষ্টি হল বিভিন্ন গ্রহ।

এই মহাবিশ্বের রহস্যের শেষ নেই। বিজ্ঞানীরা এর রহস্য সমাধানে ব্যস্ত। মহাকাশ নিয়ে এই গবেষণা অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, এখনও চলছে—এবং ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু কবে এর নির্ভুল সমাধান পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ধাঁধাঁ

সংগ্রহঃ রাফায়েল মাহবুব
কলেজ নং ৫৭৮৯
চতুর্থ শ্রেণী

হাত নাই পা নাই
দেশে দেশে ঘুরে
মানুষ না পেলে
অনাহারে মরে।
উত্তরঃ টাকা

সংগ্রহঃ তানভীর হোসেন রাজীব
কলেজ নং ৫৭৫৭
পঞ্চম শ্রেণী

মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে
মায়ের মাংস খায়
মাটিতে পড়িয়া ঘাসে
ছয় পায়ে যায়।
উত্তরঃ আমের পোকা।

সংগ্রহঃ মারুফ মোস্তফা
কলেজ নং S-8
তৃতীয় শ্রেণী

১. তিন অক্ষরে নাম তার
জলে বাস করে,
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে
আকাশ দিয়ে উড়ে॥

২. আমি থাকি খালে বিলে
তুমি থাক ডালে
তোমার সাথে দেখা হবে
মরণের কালে॥

৩. থালা ভরা সুপারী
গুণতে পারে কোন ব্যাপারী??

উত্তরঃ
১. চিতল। ২. মাছ ও মরিচ।
৩. আকাশের তারা

ভুতুড়ে গল্প 'লাশ'

মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম
কলেজ নং ৫২৮৩
একাদশ বিজ্ঞান

আষাঢ় মাস। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, সাথে হালকা বাতাস, চারিদিকে জমকালো অন্ধকার। এরই মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে শফুরুদ্দি। সে ভুতটুতে ভয় পায় না ঠিকই, কিন্তু এমন অবস্থায় অনেক ঘটনা মনে পড়ে গেল তার। তার গা ভয়ে ছম ছম করতে লাগল। সে মনে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভয়ংকর সব কথা মনে পড়ায় বার বারই যেন সে সাহস হারিয়ে ফেলছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি একটু বেড়েছে ঠিকই তবে বাতাস কমেছে। তাতে শফুরুদ্দিনের ভয় কিন্তু কমেনি। হঠাৎ সে যেন কার কথা শুনতে পেল, সে ভাবল ভালই হবে যদি কাউকে পাওয়া যায়, কিন্তু এমন অবস্থায় কে আসবে এখানে? সে বুঝতে পারছে না। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ঝোপের আড়ালে উঁকি মেরে দেখল সাদা কফিনে ঢাকা একদল লাশ চুটিয়ে আড্ডা মারছে। তাদের কারোরই মাথা নেই, বুক থেকে বাতাসে কথা ছড়াচ্ছে, তারই নীচে চোখ, কি অদ্ভুত।

হঠাৎ তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল, তার কাছে সে শুনেছে এখানে নাকি অনেকে এরকম অনেক কিছুই দেখেছে। সে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। তার চোখে যেন সব ঝাপসা হয়ে আসছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে তার সামনে থেকে সব যেন মিলিয়ে গেল। তাকে দেখে সব লাশ ভয়ে পালিয়ে গেছে, এমন ধারণা করে মনে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করছে।

আবার বৃষ্টি ভেজা কাদা মাখানো রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। সেই লাশগুলোর কথা সে চেষ্টা করেও ভুলতে পারছে না। সে দ্রুত হাঁটতে লাগল। সামনে একটু দূরে সে যেন দেখতে পেল ঘাটের উপর সাদা কাপড় পড়া কে শুয়ে আছে। আরেকটু এগিয়ে সে বুঝতে পারল সেটি ঘাট বটে তবে মানুষ ঘুমানোর জন্য নয় লাশ ঘুমানোর জন্য। ভয়ে তার শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, মাথার চুলগুলো যেন সোজা হয়ে এক একটা আস্ত সুপারি গাছ হয়ে উঠছে। শরীর কাঁপছে কিন্তু ভয়ে না শীত বুঝতে পারছে না। সে সাহস করে জিজ্ঞেস করল কে ওখানে? সে স্পষ্ট দেখতে পেল লাশটা ঘাট থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারপর ঘাট থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ভয়ে উল্টো দিকে দে ছুট। অনেকটুকু পথ দৌড়নোর পর সে রাস্তায় এক লোকের দেখা পেল। সে তাকে সব বলল এবং তার সাথে আবার আসতে লাগল; যে করেই হউক এ নরক রাত্রি থেকেতো রেহাই পেতে হবে। শফু মিয়া জোরে জোরে কথা বলে ভয় কাটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু যতই সে আগের সেই ভয়ংকর স্থানের নিকটবর্তী হচ্ছে ততই যেন তার ভয় বাড়ছে। হঠাৎ সে কি এক কথা বলে লোকটির মাথায় হাত রেখে তাকায়, সে দেখল তার সাথে যে হেঁটে যাচ্ছে সে মানুষ নয়---একটা কংকাল।

স্বাধীন দেশ

মোজাম্মেল হোসেন
কলেজ নং ৫৮৬৭
পঞ্চম শ্রেণী

স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ
সবাই বলে মুখে,
স্বাধীন দেশে কি পেয়েছি
কেউ কি তা দেখে।

রক্তমাখা একাত্তুরের পরে
স্বাধীন মনের মেলা
সেই দেশেরই মাঝে আজ
সন্ত্রাসীদের খেলা।

এদেশেতেই আজ দেখা যায়
রাইফেল, বোমা, পিস্তল
পড়ালেখা ফেলে তারা
চাঁদা তোলে বিস্তর।

এই ভাবেতে চললে এদেশ—
এদেশ হবে শ্মশান
এখনো কি ভাঙবে না ঘুম
দেশ কি হবে বিরান ?

হতাশা

রাশেদ মিনহাজ
কলেজ নং S-৭৮
তৃতীয় শ্রেণী

সকালে ঘুম থেকে উঠি
নেই পাখির কলরব,
টেবিলে খবরের কাগজে ছবি
শুধু হত্যা, শত শব।

যেদিকে তাকাই নেই
ঘন সবুজ বন
শুধু মেলে আছে
কালো থাবা, হিংস্র মন।

রাস্তায় হাঁটি যখন
নেই কোন নিরাপত্তা,
শুধুই ভাবি আজ আর
নেই কারো নিজস্ব সত্ত্বা।

হে স্রষ্টা মানুষকে দাও ফিরিয়ে
সেই সুন্দর বিবেক
মানুষের জন্য মানুষের মনে যেন
জাগে শত আবেগ।

ধাঁধাঁ।

সংগ্রহ ঃ তানভীর সিদ্দিক

কলেজ নং ৫৮৭৭
ষষ্ঠ শ্রেণী

তিন অক্ষরের নাম তার মাটির নিচে আছে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে ফল হয়ে ঝোলে গাছে
শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে সব মানুষের আছে।

উত্তর ঃ পাতাল।

সংগ্রহ ঃ আলমগীর

কলেজ নং ৫৯০৯
চতুর্থ শ্রেণী

তিন অক্ষরের নাম তার
শীতের দিনে আসে,
শেষের অক্ষর কেটে দিলে
আকাশেতে ভাসে,
মাঝের অক্ষর কেটে দিলে
গণিতের সংখ্যা মিলে।

উত্তর ঃ চাদর।

কা'বার পথে

লোকমান আহমদ আমীমী
শিক্ষক
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

ছাত্র জীবনে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলাম—'আযান দিচ্ছি'। প্রখ্যাত জনৈক আলিমের নিকট এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বললেন ঃ 'এ স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে তুমি হজ্জ করবে'। সেদিন থেকে মনের মণিকোঠায় এ আশা পোষণ করছিলাম কবে পবিত্র কা'বা শরীফ যিয়ারত করবো, আর প্রিয় মহানবী (সাঃ)-এর রওযা শরীফে হাজিরা দিবো।

মহান আল্লাহর নাম নিয়ে ১৯-৬-৯০ ইং তারিখ থেকে ২১-৭-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত ছুটির দরখাস্ত দাখিল করলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ সানন্দচিত্তে ছুটি মনযুর করলেন। তাই যথাশীঘ্র পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি বিদেশ ভ্রমণের প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করলাম।

১৯শে জুন সকালে গোসল করে নাশতা খেয়ে দু' রাকআত নামায আদায় করে আপনজনদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে সবাইকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে টার্মিনালের ভেতরে প্রবেশ করলাম। যুহরের নামাযের সময় হলে জামাআতে নামায আদায় করলাম। তারপর পরিধেয় পোশাক পরিবর্তন করে তৎস্থলে সেলাইবিহীন একখানা সাদা কাপড় লুংগি হিসেবে ও আর একখানা চাদর ইহরামের পোশাক পরার নিয়ম-মাফিক গায়ে দিলাম। তারপর সুন্নতে ইহরামের দু' রাকআত নামায আদায় করলাম। তারপর হজ্জব্রত পালন করার তীব্র বাসনা নিয়ে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করে হজ্জে কিরানের ইহরাম বাঁধলাম। পবিত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য শাওয়াল, যিলকদ দু'মাস ও যিলহজ্জের প্রথম দিনগুলো নির্ধারিত। আমি ২৫শে যিলকদ ইহরাম বাঁধলাম মানে হজ্জের কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করলাম।

যথাসময়ে বিমানে আরোহণের দুআ ও তলবিয়া পাঠ করে বিমানে উঠে সিটে বসলাম। তলবিয়ায় উচ্চারণ করতে হয় ঃ লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক লা-শারীকালাকা লাব্বায়িকা ইন্নালহামদা ওয়ান্নিয়মাতা লাকাল-মুল্‌ক লা-শারীকালাক। অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমি হাযির, হে প্রভু, আমি আপনার দরবারে হাযির। আপনার কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত সামগ্রী নিশ্চয়ই আপনার এবং আপনিই এ বিশ্বের মালিক, আপনার কোনো শরীক নেই।' ভাগ্যক্রমে আমার সিটটি দক্ষিণ দিকের জানালার পাশে ছিলো। আমাদের বিমানখানি বিকাল সাড়ে তিনটায় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ছেড়ে কলকাতা, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও আরব আমীরাতের ত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্রায় পাঁচশত মাইল বেগে গন্তব্য স্থলের দিকে উড়ে চললো। ঢাকা বিমান বন্দর থেকে বিমানটি উড্ডীন হওয়ার পর জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখলাম বিকাল বেলার সূর্যকিরণ মেঘমালার উপর পতিত হওয়ায় মনে হচ্ছিলো যেনো তুলার ধবধবে পাহাড়গুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। এমনি প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখার সুযোগ হয়নি। আসরের নামায সিটে বসেই আদায় করলাম।

সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের হজ্জযাত্রীবাহী বিমানটি নিরাপদে জিদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। বাংলাদেশ বিমানের জিদ্দাস্থ তৎকালীন স্টেশন ম্যানেজার বন্ধুবর আনওয়ারুল্লাহ চৌধুরীকে টেলেক্সের মাধ্যমে আমাদের শুভ যাত্রার কথা পূর্বেই জানিয়েছিলাম। তাই তিনি

আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা জিদ্দা বিমান বন্দরে মাগরিবের নামায জামা-আতে আদায় করলাম। তারপর কাস্টম বিভাগের পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে একটি আধুনিক রুচিসম্পন্ন রেস্তোরাঁয় গিয়ে নাশতা করলাম।

এবার পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হতে হবে। যেহেতু আমরা নন ব্যালটি পি, ফরমের যাত্রী তাই এখানে আমাদেরকেই মুয়াল্লিম ঠিক করতে হলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের হজ্জযাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য সৌদি সরকার কর্তৃক কয়েকজন মুয়াল্লিম মনোনীত আছেন। আমরা সিলেটের আদি বাসিন্দা পরবর্তীতে মক্কাবাসী জনাব রিযওয়ান মক্কী চৌধুরীকে আমাদের মুয়াল্লিম ঠিক করলাম। তারপর মুয়াল্লিমের নির্ধারিত বাসে পবিত্র মক্কার পথে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে এক মনযিলে ইশার নামায জামাআতে আদায় করলাম। জিদ্দা থেকে পবিত্র মককার দূরত্ব প্রায় ষোল মাইল। রাত তখন সাড়ে তিনটা মক্কা নগরীর উপকণ্ঠে আমাদের বাসটি পৌঁছলে মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হলো এবং খুরমা ও আবে যমযম পরিবেশন করে আমাদেরকে আপ্যায়ন করা হলো।

তারপর মিসকালা মহল্লায় (যেখানে এক সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বসতি ছিলো) একটি ভবনের ৪র্থ তলার একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা নয়শত রিয়ালে মানে বাংলাদেশী মুদ্রায় নব্বই হাজার টাকায় আমরা নয়জনে ভাড়া নিলাম। মোহাম্মদপুরের আমার তিনজন সাথী ও বাংলাদেশের আরো পাঁচজন ওই কামরার সাথী হলেন। বাসাটি সবারই পছন্দ হলো যেহেতু এখান থেকে কা'বাঘর মাত্র ৪/৫ মিনিট দূরে এবং এ মহল্লায় বাংলাদেশ হোটেল, ঢাকা হোটেল ও কক্সবাজার হোটেলে বাংলাদেশী খাবার পরি-বেশিত হতো।

এখানে উল্লেখ্য যে, তিন পদ্ধতিতে হজ্জ উদযাপন করা যায়। প্রথমতঃ হজ্জে কিরাণ। অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা যুক্তভাবে পালনীয়। এ হজ্জে ধারাবাহিক নিম্নোক্ত কাজগুলো সমাধা করতে হয়।

(১) ইহরামের জন্য গোসল করা ও নামায পড়া --- মুস্তাহাব।

(২) উমরা ও হজ্জের জন্য যুক্তভাবে ইহরাম বাঁধা --- ফরয।

(৩) তালবিয়ার দুআ পাঠ করা --- সুন্নত।

(৪) রমল ও ইযতিবা সহ প্রথমতঃ উমরার তাওয়াফ করা --- ফরয।

(৫) তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাআত নামায পড়া --- ওয়াজিব।

(৬) উমরার সায়ী বা দৌড় দেয়া --- ওয়াজিব।

(৭) রমল ও ইযতেবা সহ আগমনী তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদূম) --- সুন্নত।

(৮) তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাআত নামায পড়া --- ওয়াজিব।

(৯) সায়ী (সাফা-মারওয়ায় দৌড় দেয়া) --- ওয়াজিব।

(১০) ওযুর সাথে তাওয়াফ করা --- ওয়াজিব।

(১১) ওযুর সাথে সায়ী করা --- মুস্তাহাব।

(১২) ৯ই যিলহজ্জে আরাফাতে অবস্থান করা --- ফরয।

(১৩) মুযদালিফায় অবস্থান করা --- ওয়াজিব।

(১৪) ১০ তারিখে জামরা আকাবায় (শয়তানের প্রতীকে) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা --- ওয়াজিব।

(১৫) কুরবাণী করা ---- ওয়াজিব।

(১৬) মাথা নেড়া করা বা চুল ছাঁটা --- ওয়াজিব।

(১৭) ১০ হতে ১২ তারিখের মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত করা --- ফরয।

(১৮) তিন জামরায় ১১, ১২ তারিখে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করা --- ওয়াজিব।

(১৯) ১৩ তারিখে মিনায় অবস্থান করলে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা --- ওয়াজিব

(২০) বিদায়ী তাওয়াফ করা (বহিরাগতদের জন্য) --- ওয়াজিব।

দ্বিতীয়তঃ হজ্জে তামাত্তো অর্থাৎ উমরা ও হজ্জের পালনীয় কাজগুলো আলাদাভাবে আদায় করা।

তৃতীয়তঃ হজ্জে ইফরাদ শুধু হজ্জের করণীয় কাজগুলো আদায় করা। এ গুলোর মধ্যে কিছুটা তারতম্য আছে। প্রয়োজনে সেগুলো জেনে নেয়া অবশ্য কর্তব্য।

উমরাকে ছোট হজ্জ বলা হয়। সামর্থবান ব্যক্তির জন্য জীবনে অন্ততঃ একটি উমরা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। ৯ই যিলহজ্জ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত পাঁচদিন উমরা করা বিধেয় নয়। উমরার ধারাবাহিক কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ:

(১) উমরার ইহরাম বাঁধা ফরয। মক্কাশরীফ থেকে তানয়ীম বা মসজিদে আয়িশার দূরত্ব তিন মাইল। জেয়ের রানার দূরত্ব এগার মাইল। এ দুটি স্থানের যে কোনো একটি স্থানে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হয়।

(২) রমল (দ্রুত দৌড়) ও ইযতিবা (ডান কাঁধ খোলা রেখে বগলের নিচ দিয়ে চাদর ঘুড়িয়ে পরা) এ কাজটিও ফরয।

(৩) তাওয়াফের পর দু'রাকআত নামায (মাকামে ইবরাহীমে) পড়া --- ওয়াজিব।

(৪) সাফা—মারওয়ায় সায়ী বা দৌড় দেয়া --- ওয়াজিব।

(৫) মাথা নেড়া করা বা চুল ছাঁটা --- ওয়াজিব।

হজ্জের কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে পেশ করা হলো:—

কা'বা শরীফ: বাইতুল্লাহ শরীফের মূল ভিত্তি গোলাকার বলে তাকে কা'বা বলা হয়। কেননা কা'বা অর্থ গোলাকৃতি। এর ভেতর ফাঁকা। বর্তমানে কা'বার ভেতরে আবদুল্লা ইবনে যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত তিনটি খুঁটি রয়েছে। এ খুঁটি গুলোর উপর কা'বার ছাদ ভর করে আছে। ভেতরের দেয়ালে কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি রয়েছে। যা সুন্দর করে দেয়ালে লেখা রয়েছে। ভেতরের সৌন্দর্য ও শোভাবর্ধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিকা ঝুলানো রয়েছে। ওই শিকায় পাতিল ও কলসীর মত বিভিন্ন ভাস্কর্য শোভা পায়। ভিটি পাথরের তৈরি। ভিটিতে কোনো কার্পেট নেই। ঐতিহাসিকদের অভিমত অনুসারে পর্যায়ক্রমে এগার বার কা'বা শরীফ পুনঃনির্মিত হয়েছিলো। হযরত ইবরাহীম (আঃ), এর উচ্চতা নয় হাত নির্মাণ করেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ), এর উচ্চতা সাতাইশ হাত নির্মাণ করেন। এটি দুনিয়ার প্রথম ঘর।

সৌদি আমলে কা'বা শরীফের যে সঠিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে: দরজা সংলগ্ন সামনের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৩৩ হাত, এর বরাবর পেছনের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৩২ হাত, উত্তর দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২৭ হাত এবং দক্ষিণ দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ২০ হাত। এটাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর নির্মিত কা'বা। কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে রুকনে ইয়ামিনী, পশ্চিম-উত্তর কোণকে রুকনে শামী, উত্তর-পূর্ব কোণকে রুকনে ইরাকী, আর পূর্ব-দক্ষিণ কোণকে আসওয়াদ বলা হয়।

কা'বা শরীফের দরজা: ৯৯৯.৯৯ ধরনের মোট ২৮৬ কিলোগ্রাম খাঁটি সোনা দ্বারা কা'বা শরীফের দরজাটি তৈরি করা হয়েছে। এতে আল্লাহর নাম ও কুরআনের আয়াত লিখা আছে। দরজাটি বর্তমানে দু'অংশ বিশিষ্ট। এর মাঝখানে তালা আছে।

মুলতাযাম: হাজারে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী দেয়ালের স্থানটুকুর নাম মুলতাযাম। মুলতাযাম মানে আঁকড়ে ধরার

স্থান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের চেহারা, বুক, দু'হাত ও দু'কবষা দিয়ে এটিকে আঁকড়ে ধরে দুআ করেছেন। এটি দুআ কবুলের স্থানও বটে।

হিজরে ইসমাঈল (হাতীম) : হিজরে ইসমাঈল মানে 'ইসমাঈল কর্ণার'। পারিভাষিক অর্থে কা'বা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের অর্ধবৃত্ত দেয়ালের ভেতরের গোলাকার স্থানকে হিজরে ইসমাঈল বলা হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিশ্রামাগার হিসেবে এখানে ছায়া গ্রহণ করতেন। এখানে নফল নামায পড়া ও দুআ করা উত্তম।

মীযাবে কা'বা : নবী করীম (সাঃ)-এর শুভ জন্মের ৩৫ বছর পর কুরাইশরা যখন কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করে, তখন তারা কা'বার ছাদ দেয় এবং ছাদের পানি সরার জন্য একটি নল লাগায়. এ নলকেই মীযাব বলা হয়। এর আগে কা'বার ছাদ ছিলোনা এবং মীযাবও ছিলোনা। তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় ছাদে একটি মীযাব লাগান এবং কুরাইশদের মত তিনিও মীযাবের পানি হিজরে ইসমাঈলে পড়ার ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময় মীযাব পরিবর্তিত হতে থাকে। ১২৭৬ হিজরীতে তুর্কী সুলতান আবদুল মজীদ খান কনস্টান্টিনোপলে একটি সোনার মীযাব তৈরি করেন এবং সে বছরেই তা কা'বায় লাগান। এতে প্রায় ৫০ রতল সোনা লাগান হয়। বর্তমান কা'বায় বিদ্যমান মীযাবটিই সেই মীযাব। মীযাবের নিচে দুআ করলে সে দুআ কবুল হয়।

হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথর : কা'বা শরীফের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে তাওয়াফের জায়গা থেকে দেড় মিটার উপরে এ পাথরটি সংরক্ষিত আছে। এ পাথরটি বহু মূল্যবান ও বরকতময়। এটি বেহেশতী পাথর। নবী (সাঃ) এ পাথরটি চুমু দিয়েছেন। কাজেই এ চুমু খাওয়া সুন্নত। ভিড়ের কারণে দু'হাতের ইশারা দ্বারাও এ সুন্নত আদায় হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এ পাথরটি কা'বার পূর্ব কোণে স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুয়তের পূর্বে কুরাইশরা যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করে, তখন তিনি নিজ হাতে কা'বার দেয়ালে হাজারে আসওয়াদটি লাগিয়ে কুরাইশদের সম্ভাব্য সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটান। বর্তমানে এটির আটটি টুকরো দৃশ্যমান। বাকী অংশগুলো দেখা যায় না। হাজারে আসওয়াদের উপর বর্তমানে রূপার তৈরি গোলাকার বেষ্টনী রয়েছে।

হাজারে আসওয়াদের আভিধানিক অর্থ হলো—কালো পাথর। বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় প্রথমে পাথরটি বরফ থেকেও সাদা, রূপার মত সাদা, দুধের চেয়েও সাদা ছিলো। প্রশ্ন হলো পাথরটি সাদা পাথর না বলে কালো পাথর বলা হয় কেন? এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : 'আদম সন্তানের গুনাহই পাথরটিকে কালো করে দিয়েছে।' আল্লাহতা'লা এ পাথরটিকে বাইতুল্লাহ শরীফের কোণে প্রতীকী স্মারক হিসেবে স্থান দান করেছেন। এখান থেকেই কা'বা শরীফের তাওয়াফ শুরু করতে হয়।

মাকামে ইবরাহীম : আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মাকামে ইবরাহীম বলতে সেই ঐতিহাসিক পাথরকে বুঝানো হয়েছে যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি যখন উপরে উঠতেন পাথরটিও আল্লাহর কুদরতে উপরে উঠতো। কেননা দেয়ালের উঁচু অংশ তৈরির সময় তাঁকে উপরে উঠতে হতো। হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইবরাহীমের পাথর যোগান দিতেন এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজ হাতে সেই পাথর দেয়ালের উপর বসিয়ে ক্রমান্বয়ে উঁচু দেয়াল তৈরি করেন। একদিক

শেষ হলে অন্যদিকে যেতেন এবং বাকী দিক-গুলোর দেয়াল নির্মাণ করার আগ পর্যন্ত পাথরটি ইবরাহীম (আঃ) কে নিয়ে কা'বার চার পাশে চক্কর লাগাতো। এটি ছিলো ইবরাহীম (আঃ) এর প্রকাশ্য মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনা। এ পাথরটিতে তাঁর পায়ের দাগ বসে যায়। দীর্ঘ চার হাজার বছর পর্যন্ত অগণিত মানুষের হাতের স্পর্শ তার আসল রূপ এবং বৈশিষ্ট্য অনেকখানি মুছে গেছে। পাথরটি নরম ও জলীয় পদার্থ পূর্ণ পাথর। এটি কঠিন শ্রেণীর পাথর নয়। পাথরটি বর্গাকৃতির এবং এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় এক হাত। এর রং সাদা-কালো ও হলুদ রং মিশ্রিত।

বর্তমানে পাথর ও রূপার উপর দিয়ে প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ ২৭ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ১৪ সেন্টিমিটার। পাথরের নিচের অংশ রূপাসহ প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ ২২ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ১১ সেন্টিমিটার। দু'পায়ের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে প্রায় ১ সেন্টিমিটার। এটি বর্তমানে কা'বা শরীফের পূর্ব দিকে ২৭ হাত দূরে রয়েছে। শক্তিশালী ক্রিস্টাল গ্লাসের বাক্সে তার চারদিকে লোহা দ্বারা বেষ্টন করে মাকামে ইবরাহীমকে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

গেলাফে কা'বা : গেলাফে কা'বা আল্লাহর ঘরের প্রতি উত্তম সম্মান প্রদর্শনের উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রাচীনকাল থেকেই কা'বা ঘরে গেলাফ পরানোর নিয়ম প্রচলিত। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বা শরীফে গেলাফ পরানোর কাজকে বহাল রাখেন। তিনি ইয়েমেনী কাপড় দ্বারা কা'বা শরীফের গেলাফ পরান।

সৌদি সরকারের নির্দেশে ১৩৪৬ হিজরীতে মক্কায় প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে গেলাফ বানানোর কারখানা চালু হয়। গেলাফের উচ্চতা ১৪ মিটার এবং উপরের তৃতীয়াংশে ৯৫ সেন্টি-মিটার চওড়া নির্মিত বেল্টে, সংযুক্ত ত্রৈ-আক্ষরিক ভাবে কুরআনের আয়াত লিখা হয়। বন্ধনীতে ইসলামী কারুকার্য খচিত একটি ফ্রেম থাকে। বন্ধনীটি সোনার প্রলেপ দেয়া রূপালী আঁশের মাধ্যমে এমবয়ডারী করা হয়। এই বন্ধনীটি কা'বা শরীফের চতুর্দিকেই পরিবেষ্টিত থাকে। বন্ধনীর দৈর্ঘ হচ্ছে ৪৭ মিটার এবং তা ১৬টি টুকরায় বিভক্ত। কা'বা শরীফের যমীনে কুর-আনের আয়াত, আল্লাহর নামসমূহ ও তসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি সুন্দর রূপে খচিত আছে। কারুকার্যগুলো স্বর্ণ খচিত। প্রতি বছরই নতুন গেলাফ পরানো হয়।

বর্তমান গেলাফ তৈরিতে ৬৭০ কেজি সিল্ক ও ১৫০ কেজি সোনা ও রূপার চিকনতার দরকার হয়। গেলাফটি ৬৫৮ বর্গমিটার এবং ৪৭টি লম্বা কাপড়ের টুকরা দ্বারা তৈরি। এ কারখানায় রওযানববীর জন্যও একটি গেলাফ তৈরি হয়।

প্রত্যেক বছর যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে কা'বা শরীফের গায়ে নতুন গেলাফ পরানো হয়। হাজীরা আরাফাত থেকে ফিরে এসে কা'বা শরীফের গায়ে নতুন গেলাফ দেখতে পান। হজ্জের কয়েকদিন আগে থেকেই গেলাফের নিচু অংশ উপরের দিকে তুলে দেয়া হয় ফলে কা'বা শরীফের দেয়ালের বাইরের অংশ দেখা যায় ও ধরা যায়।

মসজিদে হারাম : আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে ১৫ জায়গায় মসজিদে হারামের উল্লেখ করেছেন। কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফের স্থান। তার চারপাশে মসজিদে হারামের ইমারত বিদ্যমান। বহুবার এর সম্প্রসারণ হয়েছে। হিজরী ১৭ সালে হযরত উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এরপর থেকে হযরত উমর (রাঃ) এর আগপর্যন্ত আর কেউ মসজিদে হারামের সম্প্র-সারণ করেননি। আজ আমরা যে মসজিদে

হারাম দেখছি, তা বহু পরিবর্তন ও সংস্কারের সিঁড়ি অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে বেজমেন্টসহ তিনতলা মসজিদের আয়তন হচ্ছে ৩ লাখ ৯ হাজার বর্গমিটার। সম্প্রসারিত মসজিদে ৬ লাখ লোক একসাথে নামায পড়তে পারে। এতে ৯০ মিটার উঁচু ৭টি মিনারা তৈরি করা হয়েছে। তাওয়াফের জায়গায় তাপ নিয়ন্ত্রণকারী সাদা মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে। তাই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পাথরগুলো ঠাণ্ডা থাকে। বর্তমানে মাতাফে একযোগে ২৮ হাজার লোক তাওয়াফ করতে পারে।

মসজিদে হারামে ৪ হাজার সাউণ্ড বক্স রয়েছে। যে গুলো ৩৫ হাজার মিটার তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। মসজিদে ৫৫ হাজার ৩২২টি বিদ্যুৎ বাতি আছে। এর প্রত্যেকটি ২৫০০ ওয়াট সম্পন্ন। ১৩৬৪টি ঝাড়বাতি আছে এবং ২১ হাজার বাল্ব আছে। মসজিদে হারামে দৈনিক ৮ মেগাওয়াট শক্তির প্রয়োজন হয়। বাতি, পাখা, মাইক, স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিঁড়ি, যমযমের পানির হিমাগার এবং অন্যান্য কাজে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়। মসজিদে হারামে ৬ হাজার ৫৫৮টি পাখা আছে। কত-গুলো পাখা বেশি শক্তিশালী বিধায় ঠাণ্ডা বাতাস সরবরাহ করে।

মসজিদে হারামে ৪৫০টি ঘড়ি আছে। এর মধ্যে ২২৫টি ঘড়ি গ্রীনিচমান অনুযায়ী সময় দেয়, আর বাকী ২২৫টি ঘড়ি স্থানীয় আরবি সময় নির্দেশ করে। এগুলো একটি মাষ্টার ঘড়ি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মাষ্টার ঘড়িটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। মসজিদে হারামের বাইরে ৬০ মিটার উঁচু ৩টি বড় ঘড়ি আছে। সেগুলো তিনটি ভাষায় সময় ঘোষণা করে।

মসজিদে হারামের সব তলায় মূল্যবান কার্পেট বিছানো আছে এবং প্রতিদিন তা পরি-ষ্কার করা হয়। মসজিদে খাদেম বা সেবকের সংখ্যা ৩ হাজারেরও বেশি। তন্মধ্যে বাংলা-দেশী, শ্রীলংকা ও ভারতীয় খাদেম অনেক আছে।

মসজিদে হারামে বর্তমানে ৩৬টি দরজা আছে। মসজিদে হারামে অনেক স্তম্ভ আছে। এগুলোর উপর নির্ভর করে নিচতলা ও দোতলার ছাদ টিকে আছে। সেগুলোর মার্বেল পাথরের তৈরি কিম্বা মোজাইক করা। অবশ্য উপরোক্ত পরিসংখ্যান সময় ও প্রয়োজনে বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে।

আবে যমযম : যমযম কূপ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত হাজিরা (রাঃ) এবং তাঁদের শিশু পুত্র ইসমাইলকে কা'বার পার্শ্বে অবস্থিত একটি বড় ছায়াদার গাছের নিচে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে চলে যান। তখন কা'বা ঘরের স্থানটি একটি উঁচু টিলার মত ছিলো। হযরত হাজির (রাঃ)-এর পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি সাফা-মারওয়ায় সাতবার পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন আওয়াজকারীর আওয়াজ শুনতে পান। তারপর কা'বার পার্শ্বে এসে দেখেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর পায়ের আঘাতে যমযম কূপের পানি উথলে উঠছে। তখন তিনি কূপের পার্শ্বে বালির বাঁধ দেন এবং মশক ভর্তি করে পানি রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মা হাজিরাকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি বাঁধ না দিতেন তাহলে তা প্রবাহমান ঝর্ণা ধারায় পরিণত হতো।

যমযম কূপ হলেও তার সেবা একটি নদীর সমান। নদীর অসীম পানির মতই যমযমের পানি গোটা দুনিয়ায় পান করা হচ্ছে এবং হাজীগণ দূর থেকে দূরান্তরে সাথে করে এ পানি নিয়ে যাচ্ছেন। হজ্জ মওসুমে প্রতিদিন ১৯ লক্ষ লিটার পানি সেবন করা হয়। দুনিয়ার অন্য

যে কোনো কূপের থেকে এর উৎপাদন ও সরবরাহ অনেক বেশি। এখন থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে এ যমযমের কূপের উৎপত্তি হয়। শরীআত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যমযমের পানি পৃথিবীর অন্য যে কোনো পানির চাইতে উত্তম। মক্কা শরীফের অন্য কূপের পানির চেয়ে যমযমের পানির ওজন এক চতুর্থাংশ বেশি। আধুনিক পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত যমযম ভবনটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভবনটি দুভাগে বিভক্ত। একটি পুরুষদের জন্য এবং অন্যটি মহিলাদের জন্য। এতে ৩৫০টি কল লাগানো আছে। এর ফলে প্রতি মিনিটে ৩৫০ ব্যক্তি এবং প্রতিদিন ৫ লাখ লোক হজ্জ মওসুমে ওই কলগুলো থেকে সহজেই পানি পান করতে পারে। মসজিদে হারামে মোট কলের সংখ্যা হচ্ছে ৭৩৪টি। তাওয়াফের জায়গায় ও মসজিদে হারামে মোট ৫ হাজার থার্মসে করে যমযমের ঠাণ্ডা করা পানি সরবরাহ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ৩২ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয়ে মসজিদে হারামের অদূরে একটি হিমাগার স্থাপন কর হয়।

যমযম কূপটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাত গভীর। নিচের মেঝেতে তিনটি ঝর্ণা ধারা রয়েছে। ঝর্ণা ধারাগুলোর একটি হচ্ছে হাজারে আসওয়াদমুখী, একটি সাফাও জাবালে আবু কোবায়েসমুখী এবং অন্যটি হচ্ছে মারওয়া পাহাড়মুখী। উপর থেকে নিচের দিকের পাকা অংশের পরিমাণ হচ্ছে ৪০ হাত এবং সেখান থেকে নিচের মেঝের দূরত্ব হচ্ছে ২৯ হাত। নিচের অংশে কোনো প্লাস্টার নেই। এর মুখের গোলাকার চক্রের পরিমাণ হচ্ছে ১১ হাত।

একাধিকবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার দ্বারা যমযমের পানিতে ক্ষতিকর বেকটেরিয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি তথাপি অতি বেগুনী আলো দ্বারা যমযমের পানি জীবাণু মুক্তকরণ পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। যমযম পৃথিবীর সেরা ও শ্রেষ্ঠ পানি। এটা শুধু পানি নয় বরং তা একাধারে পানীয়, খাদ্য ও ঔষধ হিসেবে কাজ করে বলে তা পৃথিবীর অন্য যে কোনো পানির চাইতে স্বাদের দিক থেকে অতুলনীয়।

যমযমের পানি ও ওযু করার পর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম। অবশ্য অন্যান্য সব খাবার ও পানীয় বসে গ্রহণ করা বিধেয়। যমযমের পানি পানকারী কিবলামুখী হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তিন শ্বাসে পেট ভরে পানি পান করবে। পান করার সময় পড়বে—আল্লাহুম্মা ইন্নী আসরালুকা ইলমান নাফিয়াও ওয়া রিযকান ওয়াসিয়া ওয়া শিফায়ান মিন কুল্লিদায়ীন। অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান ও প্রশস্থ রিযুক কামনা করি। আর যাবতীয় রোগ-শোক থেকে মুক্তি চাই। হাদীসে বর্ণিত আছে—যমযমের পানি খাদ্য, পানীয়, চিকিসা এবং অন্য যে কোনো নিয়তে পান করা হবে তা পূরণ হবে।

সাফা-মারওয়া : সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্তাটি আল্লাহ তা'লার পবিত্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এ দু'পাহাড়ের মধ্যে সায়ী করা ওয়াজিব। এ রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৪০৫ মিটার। সাধারণতঃ সাফা থেকে মারওয়া ও মারওয়া থেকে সাফা ৭ বার দৌড়াতে ৪০/৫০ মিনিট সময় লাগে। ইবনে বতুতা তাঁর সফর অভিজ্ঞতায় লিখেছেন—সাফা পাহাড়ে উঠার জন্য ১৪টি সিঁড়ি এবং মারওয়া পাহাড়ে উঠার জন্য ১৫টি সিঁড়ি আছে।

সৌদি শাসনামলে সাফা-মারওয়ার মধ্যকার রাস্তাটির উপর দোতলা ভবন তৈরি করা হয়। ফলে নিচতলা এবং দোতালার উপর দিয়ে সায়ী করা সহজ হয়েছে। নিচতলার দেয়ালে ২৮টি এয়ারকুলার বসানো হয়েছে, যাতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে। এছাড়া দোতলার ৬টি

ওভারব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মসজিদে যাতায়াত সুগম হয়েছে।

মা হাজিরা (রাঃ)-এর অনুসরণে সাফা মারওয়ার যে অংশে একটু জোরে হাঁটতে হয় বা দৌড়তে হয়, সেই অংশটুকুর দুই প্রান্ত সীমানায় সবুজ বাতি লাগানো হয়েছে। এগুলো ২৪ ঘণ্টা আলো দিচ্ছে। সায়ীকারীরা সেই আলোর কাছে এসে দৌড় শুরু করে এবং অন্য বাতিটির কাছে গিয়ে দৌড় বন্ধ করে। মুসলিম বিশ্বের যে কোন দিক দিয়ে যে কোন ব্যক্তি যতই বড় হোকনা কেন। মা হাজিরা (রাঃ) এর অনুসরণে তাঁকে এ দৌড়ে অংশ গ্রহণ করতে হয়। তাতে করে এ মহীয়ষী মহিলাকে আল্লাহ চিরস্মণীয় ও বরকরণীয় করে রেখেছেন। নারী জাতির জন্য এটা অবশ্যই গর্বের বিষয়।

কাবা শরীফ ধোয়া : প্রতি বছর কা'বা শরীফ দুবার ধোয়া হয়। পবিত্র রমজানের পূর্বে একবার ও হজ্জের আগে আরেকবার কা'বার ভেতর ধোয়া হয়। মক্কাশরীফের গর্ভনর ও মসজিদে হারামের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশ গ্রহণ করেন।

২০শে জুন মসজিদে হারামে পৌঁছে আগমনী তাওয়াফ, ফজরের নামায আদায়, মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায, আবে-যমযম পান ও সাফামারওয়ায় সায়ী ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করি।

৩০শে জুন (৮ই যিলহজ্জ) মিনার তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছি। তাঁবুটি মসজিদে খায়েফের নিকট হওয়ায় জামাআতে নামায পড়ার সুযোগ পাই। মক্কাশরীফ থেকে মিনার দূরত্ব হলো ৬ কিলোমিটার।

১লা জুলাই (৯ই যিলহজ্জ) সকালে মুয়াল্লিমের বাসে আরাফাতের তাঁবুতে পৌঁছি। মক্কাশরীফ থেকে এর দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার ২ মাইল দৈর্ঘ ও ২ মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট এটি একটি সমতল ময়দান। আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামেরা একটি বিরাট মসজিদ। ৫০ হাজার মুসল্লী এতে জামাআতে নামায আদায় করতে পারেন। এ মসজিদে সম্মানিত খতীবের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শোনার পর যুহর ও আসরের নামায এক আযান ও দুই ইকামতে যুহরের সময়ে পরপর জামাআতে আদায় করলাম। এ নিয়ম শুধু ওই দিনের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক সরবরাহকৃত বহু সংখ্যক নিমের চারা আরাফাতের ময়দানে লাগানো হয়। সেগুলো বড় হয়ে এখন ছায়াদার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ হাজীদেরকে সেগুলো ছায়াদান করে ও বাতাসের লহরে সবাইকে সালাম জানায়।

৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর বাসে মুযদালিফায় পৌঁছলাম। মুযদালিফা হচ্ছে মিনা ও আরাফাতের মধ্যে অবস্থিত ৪ হাজার ৩ শত ৭০ মিটার দীর্ঘ একটি জায়গার নাম। এখানে রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। এখানে পৌঁছে মাগরিব ও ইশার নামায ইশার সময়ে এক আযান ও দুই ইকামতে পরপর জামাআতে আদায় করলাম।

২রা জুলাই (১০ই যিলহজ্জ) ফজরের নামাযের পর মুযদালিকা থেকে মিনায় ফিরে আসলাম। মসজিদে সায়েফের অনতিদূরে শয়তানের তিনটি প্রতীক স্তম্ভ আছে। এ স্তম্ভ গুলোতে ৩/৪ দিন পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ১০ই যিলহজ্জ তারিখে জামরায়ে আকাবায়ে উলা বা প্রথম স্তম্ভে ৭টি কংকর মারতে হয়। এ কংকর মারার পর তালবিয়া 'লাব্বায়িক' বলা বন্ধ করতে হয়। ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ তারিখে ৭টি করে প্রত্যেক স্তম্ভে কংকর মারতে হয়। ১৩ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান কারীকেও ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করতে

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার "যেমন খুশী তেমন সাজ"
প্রতিযোগীদের মাঝে অধ্যক্ষ ও বিচারক মণ্ডলী

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ '৯৩-এর উদ্বোধন করছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুল হাই

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত চারু ও কারুকলা প্রদর্শনীতে
প্রধান অতিথি জনাব হুমায়ুন আহমেদ।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহে একটি নাটকের দৃশ্য

হয়। ১৩ তারিখে সেখানে অবস্থান না করলে কংকর মারার প্রয়োজন নেই। নিয়ম মাফিক কংকর মারা শুরু করলাম।

১০ই যিলহজ্জ হজ্জ তারিখে সরকারী ব্যবস্থাপনায় মিনায় কুরবানী সম্পন্ন করলাম। আর মাথা মুণ্ডন করে নিলাম।

১১ই যিলহজ্জ তারিখে মক্কা শরীফ গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে আবার মিনায় ফিরে আসলাম। (তাওয়াফে যিয়ারত করা ফরয)।

৮ই জুলাই জাবালে নূরের হেরা গুহায় আরোহণ করি। ২০০ মিটার উঁচু পাহাড়ের উপর চড়তে ৪৫ মিনিট লেগেছিলো, নামতেও ৪৫ মিনিট লেগেছিলো। এ পবিত্র গুহায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর সূরা আল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত (ইকরা . . .) নাযিল হয়। এখানেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রিসালাত লাভ করেন। রাসুলের জন্মস্থান, মক্কা লাইব্রেরী ও জান্নাতুল মুআল্লা কবরস্থান যিয়ারত করি। এখানে ৪৫ জন পুরুষ ও মহিলা সাহাবী ও মা খাদিজার কবর আছে।

১১ জুলাই বাদ নামাযে আসর বিদায় তাওয়াফ সম্পন্ন করলাম। রাত্রে মুয়াল্লিমের বাসে পবিত্র মদীনায় রওয়ানা হলাম। মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের দূরত্ব হলো ২৭০ মাইল। ১২ই জুলাই মদীনা শরীফ পৌঁছে ফজরের নামাযান্তে মসজিদে নববীর বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করে বিশ্বনবী হযরত মোহামদ মোস্তফা (সাঃ)-এর রওযা শরীফে সালাত ও সালাম পেশ করলাম। তাঁরই পাশে সমাহিত প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর প্রতি সালাম পেশ করে মুনাজাত করলাম। মসজিদে হারামে পাঁচজন ও মসজিদে নববীতে চার জন স্থায়ী ইমাম আছেন। তাঁরা শরয়ী আদালতের বিচারক বটে। ১২ই জুলাই থেকে ১৯শে জুলাই পর্যন্ত পবিত্র মদীনায় অবস্থান করি। সে সময় কুবা মসজিদ, সাত মসজিদ, যুলকিবলাতাঈন মসজিদ, হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) এর খেজুর বাগান, অহদ পাহাড়, অহদের যুদ্ধক্ষেত্র, অহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী ৭০ জন সাহাবীর মাযার, হযরত হামযা (রাঃ)-এর মাযার, জান্নাতুল বাকী ইত্যাদি যিয়ারত করি।

এবার বিদায়ের পালা। ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মদীনা শরীফ, আলমেবরযখের জীবন্ত মহানবী (সাঃ) কে ছেড়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিলোনা। না এসেও উপায় ছিলো না। ২১শে জুলাই ফিরতি ফ্লাইট। রাত্রে মুয়াল্লিমের বাসে আল্লাহর নাম নিয়ে মদীনা মোনাওয়ারার পুণ্যবানদেরকে সালাম জানিয়ে জিদ্দার পথে রওয়ানা হলাম। ২০শে জুলাই জিদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছে ফজরের নামায জামাআতে আদায় করলাম। সেদিন ছিলো শুক্রবার। জিদ্দা বিমান বন্দর মসজিদে জুমআর নামায আদায় করলাম। পরদিন ২১শে জুলাই রাত্রে বাংলাদেশ বিমানের জিদ্দাস্থ ষ্টেশন ম্যানেজার আমাদেরকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানালেন।

রাত্রে ইশার নামাজবাদ বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিমানে আরোহণ করলাম। সৌভাগ্যবশতঃ বিমানের ক্যাপটেন, ষ্টুয়ার্ড ও পাইলট আমার পরিচিত হওয়ায় তাঁরা আমাকে বিমানের ককপিটে নিয়ে বিমানের গতি, বাতাসের চাপ ও গতি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করালেন। সকাল ৬টায় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আমাদের বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করলো। হজ্জে যাবার সময় যাঁরা বিদায় জানিয়েছিলেন, তাঁরাই সসম্মানে বাসায় নিয়ে এলেন। পরদিন কলেজে গিয়ে জয়েনিং রিপোর্ট করলাম। আবার কলেজের গতানুগতিক সুশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু হজ্জের স্মৃতি আজোও ভুলিনি।

বোধ

জেহিন বেগম
প্রভাষক

আমার সাধের ঘুড়ি বাকাট্টা হতে হতে ফিরে
এসেছে
নিপুণ দু'হাতের লাটাই থেকে সুতো ছাড়াতে
ছাড়াতে
বহুদূর চলে গিয়েছিলো—
নীল—কন্টের মতো নীল অসীম আকাশে
আমার গোলাপী ঘুড়ি।
চৈতন্যের সুতোয় পড়ে টান, ডাক দেই ফিরে আয়
ফিরে আয়
সুদূরের তৃষ্ণা মরীচিকা শুধু, কখনো মেটেনা।
সেই বালিকা বয়সে
চেয়ে চেয়ে দেখতাম সহোদর মহাব্যস্ত গুভিডর
সুতো মাঞ্জায়
কাঁচের গুড়ো-রং-মাড় কি সব মিলিয়ে বহু যত্নে
মাঞ্জা দিতো সুতো
পাগলামী মনে হতো সব।
আজ বুঝি, এতকাল পর মাঞ্জার বড় প্রয়োজন
তা না হলে সাধের গোলাপী ঘুড়ি উড়বার অবাধ
নেশায়
উড়ে উড়ে উড়ে বাকাট্টা হয়ে যায়, মুখ থুবড়ে পড়ে
যায় ডাস্টবিন অথবা কোন বৈদ্যুতিক তারে।

চাকার মশা

মোঃ আলমগীর আলম
কলেজ নং ৫৯০৯
চতুর্থ শ্রেণী

রাজধানীতে রাজার হালে
বসছে মশা হাতে গালে,
দিনরাত চলে ঐ যন্ত্রণা
এর কোন নেই সান্ত্বনা।
মশার জ্বালায় জ্বলছে প্রাণ
কেমন করে পাবে ত্রাণ?
একটি উপায় আছে তবে
বলি শোন পরবে যবে,
লোহার পোশাক আগাগোড়া
বা রাজধানী হও ছাড়া,
তবেই পাবে শান্তি মনে
সুখে রবে প্রতিজনে।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ স্কাউট-কার্যক্রম

১৯৯২—(মার্চ-ডিসেম্বর)

কে. কে. সরকার

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্কাউটিং এর ইতিহাসে ১৯৯২ একটি গৌরবময় সন। কোন স্কুল বা কলেজে ১টি বা একাধিক কাব স্কাউট, স্কাউট এবং রোভার স্কাউট দল থাকা সেই স্কুল বা কলেজের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় ঃ তার স্বাক্ষর রেখেছে আমাদের কলেজের ক্ষুদে কাব স্কাউট দল এবং স্কাউট দল।

ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট কর্তৃক আয়োজিত ৪-৮-৯২ হতে ১০-৮-৯২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৯৯২ সনের শামস ভাই কাবাডি প্রতিযোগিতায় ঢাকা শহরের ২০টি দলের এই কাবাডি টুর্নামেন্টে আমাদের কলেজের ক্ষুদে কাবেরা কাবের মতই খেলেছিল। ১১-৮-৯২ তারিখে চূড়ান্ত খেলা উপভোগ করেছিলেন বিশেষ অতিথি হিসাবে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই, কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি, মেট্রো স্কাউটসের কর্মকর্তাসহ শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। সেদিন আমাদের কাবদের খেলা দেখে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মন্তব্য করেছিলেন—উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে এদের মধ্য থেকে জাতীয় খেলায় অংশ গ্রহণ করার মত খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে। চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশাল শিল্ডখানা তিন চারজনে উঁচু করে ধরে যখন আনন্দ উল্লাস করছিল তখনকার সেই দৃশ্য মনে রাখার মত। বিজয় গর্বে গর্বিত কাবরা যখন অধ্যক্ষ মহোদয়ের পা ছুঁয়ে সালাম করছিল তখন তিনি কাবদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—আজ তোমরা মডেল কলেজের জন্য যে সম্মান এনে দিলে সেজন্য আমি তোমাদের সবাইকে প্রাণ ভরে দোয়া করছি—লেখাপড়ার সাথে সাথে তোমরা ভাল খেলোয়াড় হতেও চেষ্টা করবে। অতঃপর অধ্যক্ষ মহোদয় কৃতি খেলোয়াড়দেরকে এক আকর্ষণীয় নৈশভোজে আপ্যায়িত করে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, যারা কৃতি তাদেরকে ব্যক্তি ও জাতি সম্মান করে। এখানে উক্ত খেলায় অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নাম উল্লেখ করা হল—

১৯৯২ সনে শামস ভাই কাবাডি খেলায় যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের নাম। ৫ম শ্রেণীর ১। শাহাদাত হোসেন, ২। কাজী সাহেদ হাসান, ৩। হুমায়ুন কবীর, ৪। সুদীপ্ত কুমার সরকার, ৫। রাশেদ নাসের, ৬। মাহিনুর রহমান (শেখ মর্তুজা), ৭। কামরুল হাসান, ৮। রিগান চন্দ্র দে, ৯। আবু সাইদ চৌধুরী (৪র্থ শ্রেণী), ১০। রিজোয়ানুর রহমান (৪র্থ শ্রেণী)।

এরপর আসে ভূইয়া ভাই স্কাউট ফুটবল টুর্নামেন্ট—স্কাউটেরা কাবদের বড় ভাই। কাবদের কৃতিত্ব স্কাউটদেরকেও অনুপ্রাণিত করল। অংশ গ্রহণ করা হল এই টুর্নামেন্টেও। ২৯-৭-৯২ থেকে ১১-৮-৯২ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টেও ঢাকা শহরের সেরা স্কুলগুলি সহ ২০-এর অধিক দল অংশ গ্রহণ করে। আমাদের স্কাউটরা খেলতে শুরু করে—একের পর এক স্কুলকে ধরাশায়ী করতে করতে ফাইনালে উন্নীত হয়। ২৬-৯-৯২ ফাইনাল খেলার দিন। ঢাকার ডি, সি, সহ বহু গণ্যমান্য লোকের আগমনে আমাদের কলেজ ময়দান মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বেজেছিল কলেজের ব্যাণ্ড। সে এক বর্ণাঢ্য দৃশ্য, খেলা হয়েছিল মীরপুর বাংলা স্কুলের সাথে। ওরাও কম যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের স্কাউটদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। ৫-৩ গোলে বিজয়ী স্কাউট খেলোয়াড়গণ যখন অধ্যক্ষ মহোদয়কে সালাম করছিলেন তখন অধ্যক্ষ মহোদয়ের

একটি মন্তব্য আমার মনে আছে—আজ সত্যই আমাদের আনন্দের দিন। আমরা কাবাডিতেও জিতলাম ফুটবলেও জিতলাম। কৃতি স্কাউট ফুটবলারদের অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর আনন্দের বহিপ্রকাশ স্বরূপ উপহার দিয়েছিলেন—বিখ্যাত চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আপ্যায়িত করে। সেখানে কলেজের কেন্দ্রীয় প্রিফেকটরিয়াল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ও বর্তমান উপাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। এই খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়-দের নাম উল্লেখ করছি—

ভূইয়া ভাই আন্তস্কুল স্কাউট ফুটবল খেলার খেলোয়াড়দের নামের তালিকা।

১০ম শ্রেণীর ১। শামীম এহসান, ২। তৌহিদুজ্জামান ভূইয়া, ৩। সুলতান মোঃ আল জাভেদ ৪। ইউছুফ রাসেল, ৫। মামুনুর রশীদ, ৬। শেখ মোঃ নাজমুল আলম, ৭। মতিউর রহমান, ৮। ফকির কামরুজ্জামান, ৯। সাহেদ সাদউল্লাহ, ১০। ওমর ফারুক, ১১। সাব্বির আহমেদ, ১২। আকন মোঃ রায়হান, ১৩। তৈয়াব উল্লাহ, ১৪। তৌফিকুল ইসলাম, ১৫। নাসের আমজাদ (৮ম শ্রেণী), ১৬। আশরাফুল ইসলাম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)।

এরপর আসে ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ তারিখ মেট্রো স্কাউটসের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা; অনুষ্ঠিত হয় আমাদের কলেজ মাঠেই। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত ও বিভিন্ন ইভেন্টে আমাদের কাব ও স্কাউটদের মধ্য থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ৮ জন কাব ও স্কাউট—এদের মধ্যে তিনজন প্রথম ও দুইজন দ্বিতীয় পুরস্কার পায় যা কোন স্কুলের পক্ষে এককভাবে সম্ভব হয়নি। নিম্নে কৃতি এথলেটদের নাম উল্লেখ করছি।

১। ৫৪৮৫ মোঃ আল মামুন ১ম ১০০ মিঃ গ্রুপ এ, ২। ৫৫১৮ আবু সাইয়েদ চৌধুরী ২য়, ৩। ৫২০৭ আজিজুর রহমান ১ম ১০০ মিঃ দৌড় গ্রুপ সি, ৪। ২৫৫৩ মোশেদী জাহান ২য় ৫। ৫২০৩ মহিনুর রহমান ২য়।

শিক্ষা সফর

এরপর আসা যাক কলেজের স্কাউটদের অন্যান্য কার্যক্রম। প্রথমেই শিক্ষা সফর—৪০ জন স্কাউটের একটি ট্রুপ বিগত ১৩-১১-৯২ তারিখে একদিনের শিক্ষা সফরে কুমিল্লার ময়নামতিতে যায়। সেখানে তারা ময়নামতিতে অবস্থিত আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ প্রাণ ভরে উপভোগ করে। সঙ্গে ছিলাম আমরা দুইজন শিক্ষক। লক্ষ্য করেছিলাম তারুণ্যের উদ্দীপনা কত মধুর। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে, পাহাড়ের গুহায় চড়াই উৎরাই পার হয়ে যে ভাবে আমাদের স্কাউটরা শৃঙ্খলার সাথে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখেছে তাতে এ আশাই জেগেছিল এদেরকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে একদিন ওরা গন্তব্যস্থলে পৌছাবেই।

বড় ভাইয়েরা কুমিল্লা গেল? স্যার আমাদের কোথাও নিয়ে যাবেন না? ছোট স্কাউট অর্থাৎ কাবদের এই জিজ্ঞাসার জবাব তৎক্ষণাৎ না দিয়ে শুধু বলেছিলাম—ঠিক আছে আমি প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে আলাপ করে তোমাদের জানাব। অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমার কাবদের মনের আবেগ জানালাম। আনন্দের বিষয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে কোন প্রশ্ন না করে শুধু বললেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করুন। দিন ঠিক হল ২২-১-৯৩ তারিখ। সারাদিনের প্রোগ্রাম, ৬০ জন কাব, ৫ জন সিনিয়র স্কাউট, ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ১ জন অভিভাবক সমন্বয়ে গঠিত কাব প্যাক সারাদিনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় সাভার অভিমুখে সাভার ডেইরী ফার্ম, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন শেষে সন্ধ্যায় প্যাকটি ফিরে আসে কলেজ

প্রাঙ্গণে। উল্লেখ্য, কাবদের ও অন্যান্যদের সারা-দিনের খাবার-দাবার সবই সঙ্গে ছিল এবং যথাসময় তার সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল। আরও সরফুদ্দিন আদিল নামক এক কাবের অভিভাবকের বদান্যতায় ঐ সফরের একটি ভিডিও ক্যাসেট করা হয়েছিল। সফরসঙ্গী ছিলেন না এমন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র ভিডিও ক্যাসেটে সেদিনের কাবদের কার্যক্রম ও শৃঙ্খলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

বার্ষিক তাঁবু বাস

বিগত ৩০-১-৯৩ তারিখ হতে ৩-২-৯৩ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক তাঁবু বাসে আমাদের কলেজের ২৪ জন স্কাউট নিয়ে গঠিত একটি পেট্রল অংশগ্রহণ করে। ৫ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ তাঁবু বাসের নেতৃত্বে ছিলেন ২ জন শিক্ষক। এই তাঁবু বাস মডেল কলেজের স্কাউটিং এর ইতিহাসের সবচাইতে গৌরবময় অধ্যায়—এতদিন এই কলেজের স্কাউট দলটি একটি আঞ্চলিক দল হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তাঁবু বাসে আমাদের স্কাউট-দের কার্যক্রম দেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ স্বীকার করতে কুন্ঠিত হন নাই যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের পেট্রলকে জাতীয় দলের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। অংশগ্রহণকারী ৮০টি দলের মধ্যে যে ১৫টি দলকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি দেয়া হয় আমাদের কলেজের দল তাদের মধ্যে অন্যতম।

বিভিন্ন দিক বিচার করলে দেখা যায় ১৯৯২ সনটি মডেল কলেজের স্কাউটিং এর ইতিহাসে একটি অনন্য সন। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে আমাদের মত কলেজে কাব-স্কাউট, বয়েজ স্কাউট, রোভার স্কাউট থাকা যে কতখানি প্রয়োজন তা নতুন করে আমাদের চেতনায় এনেছেন আমাদের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই। বলতে দ্বিধা নেই ইতিপূর্বে কোন অধ্যক্ষই কাবিং স্কাউটিং এর প্রতি বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয়ের মত এত আগ্রহ দেখান নাই। আমাদের কাব স্কাউট ও স্কাউট দলকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি একজন শিক্ষককে স্কাউট মাষ্টার হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং একজন স্কাউটিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক নিযুক্ত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কাউট মাষ্টারের অভাব পূরণ করেছেন। এখানে বর্তমান উপাধ্যক্ষ জনাব শামসুল হক এর নাম উল্লেখ না করলে উনার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। স্কাউটিং এ পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই জাতীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। স্কাউটিং সংক্রান্ত কোন পরামর্শের জন্য উনার দ্বারস্থ হলে উনি শত ব্যস্ততার মাঝেও স্কাউটিংকে ঠিক পথে পরিচালিত রাখার জন্য সর্বদাই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। স্কাউটিং কাবিং এর প্রতি অধ্যক্ষ মহোদয়ের কতখানি আস্থা তা আমি উনার একটি উক্তি থেকেই উপলব্ধি করেছি আর তা হল--কোন প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার একটি প্রধান বাহন হল ঐ প্রতিষ্ঠানের সুশৃঙ্খল স্কাউটবৃন্দ ও কাবদল।

বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই এঁর অনুপ্রেরণায় এই কলেজের কাব স্কাউট ও স্কাউটবৃন্দ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে এ আশা নিয়েই আজকের প্রতিবেদন শেষ করছি।

খেলাধুলা

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগে ৪ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষকগণ হলেনঃ ১। জনাব মোঃ সুলতান উদ্দিন, ২। জনাব জেড. এইচ. মাহবুব আমজাদ, ৩। জনাব খলিলুর রহমান, ৪। জনাব আব্দুল মালেক। তাছাড়া আছে একজন স্পোর্টস বেয়ারা, জনাব মোঃ শফিউল্লাহ। অন্যান্য বছরের মতো শারীরিক শিক্ষা বিভাগ এবারও (১৯৯২/৯৩ শিক্ষাবর্ষ) ৫টি বহিঃরাঙ্গন ক্রীড়া এবং তিনটি অন্তঃরাঙ্গন ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করেছে।

নিম্নে খেলার সার্বিক ফলাফল উল্লেখ করা হলো ঃ—

অন্তঃরাঙ্গন ক্রীড়া (জুনিয়র শাখা)

খেলা	চ্যাম্পিয়ান	রানার্স আপ
দাবা	জ/হা	কু/হা
ক্যারাম	কু/হা	জ/হা
টেবিল টেনিস	কু/হা	জ/হা

অন্তঃরাঙ্গন ক্রীড়ায় কুদরত-ই-খুদা হাউস চ্যাম্পিয়ন।

অন্তঃরাঙ্গন ক্রীড়া (সিনিয়র শাখা)

খেলা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ
টি, টি	লা/হা	ন/হা
ক্যারাম	লা/হা	ন/হা
দাবা	ন/হা	ফ/হা

অন্তঃরাঙ্গন ক্রীড়া সিনিয়র শাখার লালন শাহ হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং নজরুল ইসলাম হাউস রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বহিঃরাঙ্গন ক্রীড়া (সিনিয়র শাখা)

খেলা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ
ফুটবল	ফ/হা	লা/হা
ভলিবল	ফ/হা	লা/হা
ক্রিকেট	ফ/হা	লা/হা
বাস্কেটবল	ফ/হা, লা/হা, ন/হা	(যুগ্মভাবে)
হকি	অনুষ্ঠিত হয়নি	

সিনিয়র শাখায় বহিঃরাঙ্গন ক্রীড়ায় ফজলুল হক হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং লালন শাহ হাউস রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বহিঃরাঙ্গন ক্রীড়া (জুনিয়র শাখা)

খেলা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ
ফুটবল	কু/হা	জ/হা
ভলিবল	জ/হা	কু/হা
বাস্কেটবল	কু/হা	জ/হা
ক্রিকেট	জ/হা	কু/হা
হকি	কু/হা, জ/হা	(যুগ্মভাবে)

জুনিয়র শাখার বহিঃরাঙ্গন ক্রীড়ায় দুই হাউসই যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করেছে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জুনিয়র শাখায় শ্রেণীভিত্তিক এবং সিনিয়র শাখায় তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে অনুষ্ঠিত হয়। এতে জুনিয়র শাখায় কুদরত-ই-খুদা হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। অন্যদিকে সিনিয়র শাখায় ফজলুল হক হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং নজরুল ইসলাম হাউস রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

জুনিয়র শাখায় চতুর্থ শ্রেণীর (শাখা ক) খায়রুল আলম এবং সিনিয়র শাখা একাদশ মানবিকের কাজী বোরহান উল্লাহ সেরা ক্রীড়াবিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

তাছাড়া শারীরিক শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিভাবক দিবস পালন। অভিভাবক দিবসে ছাত্রদের সিরিমনিয়াল প্যারেড, পি, টি, ডিসপ্লে এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এ সব কিছুরই পৃষ্ঠপোষক এই ঐতিহ্য-বাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ।

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাস্টার ঃ এ, বি, এম, শহীদুল ইসলাম
হাউস টিউটর ঃ মিসেস মাহবুবা হাবীব
হাউস এলডার ঃ শাহনূর আলম সুমন
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাহ্‌মুদুল আলম পায়েল।

কুদরত-ই-খুদা হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের পাঁচটি ছাত্রাবাসের মধ্যে সর্ব-বৃহৎ ছাত্রাবাস। স্বাধীনতার পর কিছুকাল ১নং হাউস হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বাংলার কৃতি সন্তান, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী স্বনামধন্য ডঃ কুদরত-ই-খুদার নামানুসারে পরিচিত। তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা এ হাউসে আবসিক ছাত্র হিসাবে থাকে। সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত হাউসটিতে ক্ষুদে ছাত্রদের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া এবং খেলাধুলার সব রকম সুযোগ-সুবিধাই আছে। কিছু কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে তবে তা সমাধানযোগ্য।

প্রতি বছর তৃতীয় শ্রেণীর নতুন ছাত্ররা হাউসে আসে। প্রাথমিক অবস্থায় নতুন পরিবেশে কিছু সমস্যার সম্মুখীন তারা অবশ্যই হয়। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা হাউসের পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়। নানা পরিবেশ এবং নানা সামাজিক অবস্থান থেকে আসা এই ক্ষুদে ছাত্রদের জন্য হাউসটি হয়ে ওঠে মহামিলনক্ষেত্র। ব্যাপারটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কলেজের এবং হাউসের নিয়ম অনুযায়ী একসাথে ঘুম থেকে ওঠা, একসাথে খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া, খেলাধুলা, একই পোষাকে একই সাথে স্কুলে যাওয়া প্রভৃতি ছকে বাঁধা নিয়ম অতি দ্রুত তাদের মধ্যে রচনা করে বন্ধুত্বের দৃঢ় সেতুবন্ধন। এবং অতি কাঁচা বয়সের এ সম্পর্ক টিকে থাকে আমৃত্যু। কচি বয়স থেকেই এরা গড়ে ওঠে স্বাবলম্বী হয়ে, শেখে সময়ানুবর্তী ও নিয়মানুবর্তী হতে।

হাউস সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে প্রতি হাউসেই থাকে হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটর কর্তৃক মনোনীত ছাত্রদের পরিষদ। এদের আমরা বলি হাউস প্রিফেক্টস। হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এরা হাউস পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এভাবেই এদের মধ্যে বিকশিত হয় নেতৃত্বের গুণাবলী।

সারা বছর ধরে ছকে বাঁধা নিয়েমের সহায়তায় ছাত্ররা যেমন লেখাপড়ায়, তেমনটি খেলাধুলায় হয়ে ওঠে চৌকষ। ১৯৯২ সনের হিসাবে দেখা যায় লেখাপড়ায় প্রতিক্লাসে ১ম থেকে ১০ম স্থানের মধ্যে রয়েছে হাউসের একাধিক ছাত্র। এদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ৫৭২৯ মোঃ আরাফাত খান, চতুর্থ শ্রেণীর ৫৪৬৮ তাইমুর রশীদ ও ৫৫০১ মোঃ হাফিজ-উল্লাহ্‌, পঞ্চম শ্রেণীর ৫২৬৬ মাহ্‌মুদুল হক (মুন্না) ও ৫২৮১ গোলাম মর্তুজা, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৪৩৪৯ আবু নোমান, ৪৩৫১ তানভীর মাহমুদ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯৯২ সনের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং বার্ষিক সংস্কৃতি সপ্তাহে ছাত্ররা অর্জন করেছে গৌরবময় কৃতিত্ব। ১৯৯২ সনের খেলাধুলার খতিয়ান নিম্নরূপ।

ফুটবল — চ্যাম্পিয়ন
বাস্কেটবল — চ্যাম্পিয়ন
হকি — যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন
দাবা — চ্যাম্পিয়ন

টেবিল টেনিস—গোলাম সারোয়ার ৭ম শ্রেণী
উইং বস্ট

দাবা—আবুল হাসান ৭ম শ্রেণী উইং বেস্ট

ক্যারাম—রহমান রাজীব মাহমুদ উইং বেস্ট

*বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—চ্যাম্পিয়ন

*বার্ষিক সংস্কৃতি সপ্তাহ—চ্যাম্পিয়ন

এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আযান-কিরাত প্রতিযোগিতায় এদের রয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

একথা বলতেই হবে যে হাউসের এ সাফল্য কারো একক প্রচেষ্টার ফসল নয়। এ সাফল্য হাউসের সাথে এবং ছাত্রদের সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট সবার। এ সাথে বলা প্রয়োজন—অব্যাহত ধারায় একশত ভাগ সাফল্যের প্রত্যাশা এক অলীক স্বপ্ন। আমরা তেমন স্বপ্নে বিশ্বাসী নই। তাই বলতে দ্বিধা নেই সাফল্যের যে উজ্জ্বল দীপ্তি তার পাশা-পাশি কিছু ব্যর্থতার আঁধার অবশ্যই আছে।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার মাত্রা নেমে আসুক একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে, ছাত্রা-বাসটির আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাক অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এটাই আমাদের সবার ঐকান্তিক কামনা।

—o—

জয়নুল আবেদীন হাউস

হাউস মাস্টার ঃ জনাব ফয়জুর রহমান
হাউস টিউটর ঃ জনাব আমিনুল ইসলাম
হাউস এল্ডার ঃ মাস্টার মাহবুবুন নব্বী
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাস্টার আশরাফুল ইসলাম।

ছায়া সুনিবিড় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের জুনিয়র দুটি ছাত্রাবাস রয়েছে। এর মধ্যে জয়নুল আবেদীন হাউস একটি। আজ ১৯৯৩ সাল থেকে প্রায় ৩২ বছর পূর্বে ১৯৬১ সালের ১লা মে এই স্কুলের অন্যতম ছাত্র-বাসটির জন্ম হয়। '৬১ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রাবাসটির বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আয়ুব হাউস, শহীদ নিজাম-উদ্দিন হাউস, ২নং হাউস ইত্যাদি। পরিশেষে বিভিন্ন নামকরণের পর '৮৩ সালে মহান শিল্পী জয়নুল আবেদীনের নাম অনুসারে এই ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয়, 'জয়নুল আবেদীন হাউস'। এ নামেই এ অর্ধশতাব্দীর হাউসটি তার নিজস্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে আছে। এখানে তৃতীয় থেকে ৭ম শ্রেণীর মোট ১৪০ জন ছাত্রের আবাসিক সংস্থান আছে। ছাত্রদের থাকার জন্য বড় পাঁচটি রুম এবং ছোট তিনটি বিশেষ রুম আছে। এছাড়া খাওয়ার, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা, নামায পড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা আরও কয়েকটি রুমে হয়ে থাকে, ছাত্রাবাসের মধ্যেখানে শ্রীবর্ধনের জন্য একটি সুন্দর বাগান অবস্থিত।

এ হাউসের দেখাশুনার জন্য হাউস মাস্টার হাউস টিউটর ব্যতীত একজন মেট্রন ও মোট ১০ জন কর্মচারী রয়েছে। হাউস পরিচালনের জন্য প্রতি বছর প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড গঠন করা হয়। প্রত্যেক পদে দুইজন করে প্রিফেক্ট থাকে এবং তারা তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিনিয়ত পালন করছে।

লেখাপড়া, খেলাধুলা এবং বিভিন্ন সহপাঠ্য-ক্রমে এ হাউসের ছাত্রদের কৃতিত্ব অর্জন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতি বছরের মত ১৯৯২ সালের তৃতীয় পাবিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীর মাস্টার জাকির হোসেন প্রথম, মাস্টার সৈয়দ মুহাম্মদ জাহিদ দ্বিতীয়। চতুর্থ শ্রেণীর মাস্টার মোঃ রাসেল প্রথম। পঞ্চম শ্রেণীর মাস্টার এস, এম শামিউল আলম প্রথম। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মাস্টার আমিনুল এহসান প্রথম এবং মাস্টার সুলতান মাহমুদ তৃতীয় হবার গৌরব অর্জন করেছে।

খেলাধুলায় ১৯৮৪, '৮৬, '৮৭, '৮৮, '৮৯, '৯০-এ প্রতি বছরেই সামগ্রিকভাবে—চ্যাম্পিয়নশীপ এ হাউসে আসে এবং ১৯৯২ সালে কেরাম, টেবিল টেনিস, ক্রিকেট, এবং ভলিবলে চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জনে সমর্থ হয়। এ হাউসের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মাস্টার আশরাফুল ইসলাম পর পর তিন বার জুনিয়র 'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ' পাবার গৌরব অর্জন করে। এ পর্যন্ত জুনিয়ারে পর পর তিনবার এ পুরস্কার লাভ করতে কেউ সমর্থ হয়নি।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জয়নুল আবেদীন হাউসের গৌরব অতুলনীয়। ১৯৮৭, '৮৮, '৯০, '৯১, '৯২ সালে বহু পয়েন্টের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয়। গানে সাইফুর রশীদ, তানজীর আলম, রাজিব, কামরুল খান পলাশ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জাহিদ জহিরুল্লা, নাঈম চৌধুরী সকলের কাছে পরিচিত।

আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় হাউসটির সুনাম রয়েছে। পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতায় ১৯৮৩, '৮৪, '৮৫, '৮৬, '৮৭, '৮৮, '৮৯, '৯০, '৯১,—এ নয় বছর পর পর চ্যাম্পিয়নশীপ এ হাউসের শোভা বৃদ্ধি করেছে।

জয়নুল আবেদীন হাউসের নানাবিধ সমস্যা আছে। এর অর্ধদ্বিতল ভবনের অধিকাংশ অসমাপ্ত। আগের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় সব ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদানে হাউসটিকে বিভিন্ন সময়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার সাধ্য অনুযায়ী সবরকম অসুবিধা সর্বক্ষণ দূর করার প্রচেষ্টা করছে।

সর্বোপরি, জয়নুল আবেদীন হাউসের যা গৌরব তা কারও একার নয়। এখানকার আবাসিক, অনাবাসিক সকল ছাত্রের, কর্মচারীবৃন্দের এবং কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার ফলে হাউসটির সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ হাউসের সকল ছাত্রের এবং কর্মচারীদের অবস্থান সুখের হোক, শান্তির হোক এবং আনন্দময় হয়ে উঠুক। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে এ দোআ কামনা করি।

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাস্টার ঃ প্রলয় কুমার গুহ নিয়োগী
হাউস টিউটর ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা
হাউস এলডার ঃ আরিফ আমিন
হাউস প্রিফেকট ঃ সালেহ আহমেদ জামী।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই প্রতিষ্ঠানের হাউসগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফজলুল হক হাউস এই হাউসগুলির অন্যতম। দেশপ্রেমিক চিরঞ্জীব শের-এ-বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী ছাত্রদের মধ্যে রূপায়িত হবার মহান আদর্শকে সামনে রেখে এই হাউসের নামকরণ করা হয়েছে ফজলুল হক হাউস। তাই এ নামের আলোকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই হাউসের ছাত্র-বৃন্দ কলেজের সকল কর্মকাণ্ডে তাদের পার-দর্শিতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

জীবন গঠনের কোন এক পর্যায়ে ছাত্ররা এখানে এসে তাদের জীবনের বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত অবস্থান করে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তাদের কাছে হাউস নয় এখানে এসে তারা যেন নিজেদেরকে একটি বিশেষ পরিবারের সদস্য হিসেবে অনুভব করে। শুধুমাত্র হাউস মাস্টার হাউস টিউটরই নন, এখানকার সমস্ত কর্মচারী এবং ছাত্ররা মিলে প্রাণ ঢালা স্নেহ ভালবাসা আর আন্তরিকতার মাধ্যমে যেন একটি সস্নেহ পারিবারিক মণ্ডল গড়ে তোলে।

'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ,' লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণই ছাত্রদের প্রধান তপস্যা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা শিক্ষার মাধ্যমেই জীবনে পরিব্যপ্তি ও পরিস্ফুটন ঘটে। এই হাউসের ছাত্রদের এই সত্যটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে। ১৯৯২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় আসন লাভ করে তারা নিজেদের যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি হাউসের গৌরবোজ্জ্বল ইতি-হাসকে করেছে সমৃদ্ধ। পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করে নূর-এ-আলম মিনা মেধা তালিকায় আসন লাভ করেছে। এ হাউস শুধু-মাত্র তার অতীত গৌরব নিয়েই তৃপ্ত নয়। মঞ্জুর-ই-আলম, আবদুল মালেক, এবং মোহাম্মদ জাহিদউদ্দিন প্রভৃতি ছাত্রের কাছ থেকে সোনালী ভবিষ্যৎ হাউসের কাম্য।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা আমাদের জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাউসের ছাত্ররা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এবং ক্রীড়াঙ্গনেও রেখেছে তাদের দৃপ্তপদক্ষেপের চিহ্ন। '৯১ সালের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মারুফ-উল-ইসলাম শতদল গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে হাউসের গৌরবকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে।

শুধুমাত্র কলেজের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতেই নয়, জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের গৌরবেও এরা অভিষিক্ত। দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগে তৌহিদুজ্জামান ভুঁইয়া এবং জনতা ব্যাংক পাইওনিয়ার ফুটবলে এনামুল ফারুক শক্তি বিশেষ পারদর্শিতার নিদর্শন রেখেছে।

খেলাধুলায় এই হাউসের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত, সোনালী বর্তমান এবং সুবিশাল সম্ভাবনা-ময় ভবিষ্যত। ১৯৯৩ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাউসের সাহেদ সাদুল্লাহর সাথে সাথে জুনিয়র গ্রুপে "গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন" এবং ১৯৯২ সালের "সেরা ক্রীড়াবিদ" হয়ে তৌহিদু-জ্জামান ভুঁইয়া হাউসের অতীত ইতিহাসকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ফুটবলে মতিউর রহমান, ফকির কামরুজ্জামান এবং এনামুল ফারুক শক্তি, ভলিবলে আরিফ আমিন, সালেহ আহমেদ জামী, এনামুল ফারুক শক্তি, বাস্কেটবলে ইফতেখারউদ্দিন, আহসানুল হক, কবির হোসেন, সালেহ আহমেদ জামী এবং

ক্রিকেটে মোখতার আহমেদ ও গোলাম আরিফ মুস্তাসির তাদের প্রশংসনীয় অবদানের জন্য কলেজ পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে স্বীকৃত।

এছাড়া ১৯৯৩ সালের আন্তঃশ্রেণী প্রিন্সিপাল কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় এ হাউসের সালেহ আহমেদ জামী শ্রেষ্ঠ গোল দাতার গৌরব অর্জন করেছে।

আন্তঃ কলেজ ভলিবলে আরিফ আমিন ও এনামুল ফারুক বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে।

আমাদের গৌরব শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ থাকেনি। সমষ্টিগত ভাবেও আমরা তা প্রমাণ করেছি। '৯১-এর আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতায় এই হাউস প্রথম স্থান দখল করেছে। '৯৩-এ হাউস সামান্য পয়েন্টের ব্যবধানে রানার্স আপ হয়েছে।

বছরান্তে একদল ছাত্র আসছে এবং মেয়াদান্তে একদল বিদায়ও নিচ্ছে। এছাড়া কিছু অনাবাসিক ছাত্রও এ হাউসের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আবাসিক-অনাবাসিক সকল ছাত্রই হাউসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে হাউসের ঐতিহ্যকে গড়ে তুলেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ছোটবড় সকল ছাত্র, হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর, এবং হাউসের সাথে সংশ্লিষ্ট আর সবাইকে নিয়েই আমরা একটি পরিবার। স্নেহ ও প্রীতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আমরা সবাই। বাংলার বাঘ শের-এ-বাংলার মহান ভাবধারায় নবীন প্রাণের উচ্ছলাবেগে সকল বাধা বিপত্তিকে ভাসিয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে—এটাই আমাদের সকলের হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনা।

—o—

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার ঃ জনাব আতাউল হক
হাউস টিউটর ঃ জনাব খালেদুর রহমান
হাউস এল্ডার ঃ মাস্টার আজগর আজিজ
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাস্টার তাহমিদ জং।

বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়েল মডেল কলেজে আবাসিক ছাত্রদের জন্য পাঁচটি হাউস রয়েছে। বহু ছাত্র অনাবাসিক হিসেবে বিভিন্ন হাউসের সাথে সংযুক্ত আছে। এই পাঁচটি হাউসের অন্যতম নজরুল ইসলাম হাউস। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিকে অম্লান রাখা ও তাঁর আদর্শকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে জাগরিত রাখার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই হাউসটির নাম করণ করা হয়, নজরুল ইসলাম হাউস। কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যে সকল ছাত্র এই হাউসে অবস্থান করেছে এবং এখনও যারা অবস্থান করছে তারা এই হাউসের জন্য গর্বিত।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেধাবী ছাত্ররা তাদের জীবনকে বিকশিত করার লক্ষ্যে এ কলেজে পড়তে আসে এবং বিভিন্ন হাউসে অবস্থান করে। ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ, দায়িত্বশীল ছাত্রদের নিয়ে গর্বিত প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডের সদস্যদের সহযোগিতা, হাউসের কর্মচারীদের আন্তরিক

সেবা-যত্ন এবং সর্বোপরি হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরের প্রাণঢালা স্নেহভালবাসায় এ হাউসে গৃহের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হাউসে অবস্থান কালে ছাত্ররা তাই সহজেই আপন গৃহের পরিবেশ ভুলে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারে।

লেখাপড়া ও জ্ঞান অন্বেষণ করা ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্ব। নজরুল ইসলাম হাউসে লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। এ হাউসে বর্তমানে আসন সংখ্যা ১০২টি। প্রতিটি আসন ছাত্রদের দ্বারা সর্বদাই পূর্ণ থাকে। ছাত্ররা লেখা-পড়ার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল সে কথা প্রমাণ করে। ১৯৯২ সনের তৃতীয় পাবিক পরীক্ষায় নবম মানবিক শাখার ইমরানুল আযম দ্বিতীয়, একাদশ বিজ্ঞান শাখার হাসান জুবায়ের প্রথম এবং একাদশ মানবিক শাখার মাইদুল ইসলাম তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তাছাড়া মাধ্যমিক নির্বাচনী পরীক্ষায় দশম মানবিক শাখার ইসরাত হাসান আদিব এবং উচ্চ মাধ্যমিক নির্বাচনী পরীক্ষায় দ্বাদশ মানবিক শাখার জিহাদ উদ্দীন প্রথম স্থান অধিকার করে।

তবে পুঁথিগত বিদ্যাই জ্ঞানার্জনের একমাত্র উৎস নয়। জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে প্রয়োজন সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের। কলেজের সাংস্কৃতিক কর্ম-কাণ্ডে ও খেলাধুলায় এ হাউসের ছাত্ররা তাদের সৃজনশীল প্রতিভা ও অনুশীলনের মাধ্যমে হাউ-সের পতাকাকে সদা সমুন্নত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯৯৩ সনের সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পি-য়ান হওয়ার মাধ্যমে এ হাউসের ছাত্ররা তারই প্রমাণ রেখেছে। পল্লব গ্রুপ থেকে দশম বিজ্ঞান শাখার ছাত্র আমিনুর রশীদ এবং শতদল গ্রুপ থেকে দ্বাদশ বিজ্ঞান শাখার ছাত্র তানভীর আলম সজীব গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়ে হাউসের উজ্জ্বল ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে।

আউটডোর ও ইনডোর গেমসে নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের দাবীদার। ১৯৯২ সনে এই হাউস বাস্কেট বলের যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান এবং দাবায় চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করে। তাছাড়া ১৯৯৩ সনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হয়ে তারা প্রমাণ করছে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে। ক্যারামে একাদশ মানবিক শাখার হাসিমুল হক জ্যোতি উইংবেস্ট এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একই শ্রেণীর কাজী বোরহান উল্লাহ্ একই সাথে সিনিয়র গ্রুপের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান এবং কলেজের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রেখেছে। ভবিষ্যতে এই হাউসের ছাত্ররা তাদের পূর্বসূরীদের অর্জিত সাফল্যকে অতিক্রম করবে এই আশা করা যায়।

নিয়মশৃংখলা ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্ররা কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়মশৃংখলার প্রতি তাদের আনুগত্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। মনিং পি টি, খেলার মাঠ, প্রভৃতি বিভিন্ন অংগনে এ হাউসের ছাত্র-দের নিয়মশৃংখলা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে।

বছরান্তে এই কলেজে একদল নতুন ছাত্র আসে এবং মেয়াদান্তে একদল ছাত্রকে বিদায় দেয়া হয়। এই পালাবদলের খেলায় হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর মূলতঃ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। হাউসের জীবনকে একমাত্র পারিবারিক জীবনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যে আকাঙ্ক্ষা বুকে লালন করে তরুণেরা হাউসে প্রবেশ করে, তাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াতেই হাউসের স্বার্থকতা।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণ করছেন
প্রধান অতিথি জনাব হুমায়ুন আহমেদ

শহীদ দিবসে শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পণ করছে
কেন্দ্রীয় প্রিফেক্টবৃন্দ ও অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

উর্মি
জয়নুল আবেদীন হাউস-১৯৯১

দর্জয়
কুদরত-ই-খুদা হাউস

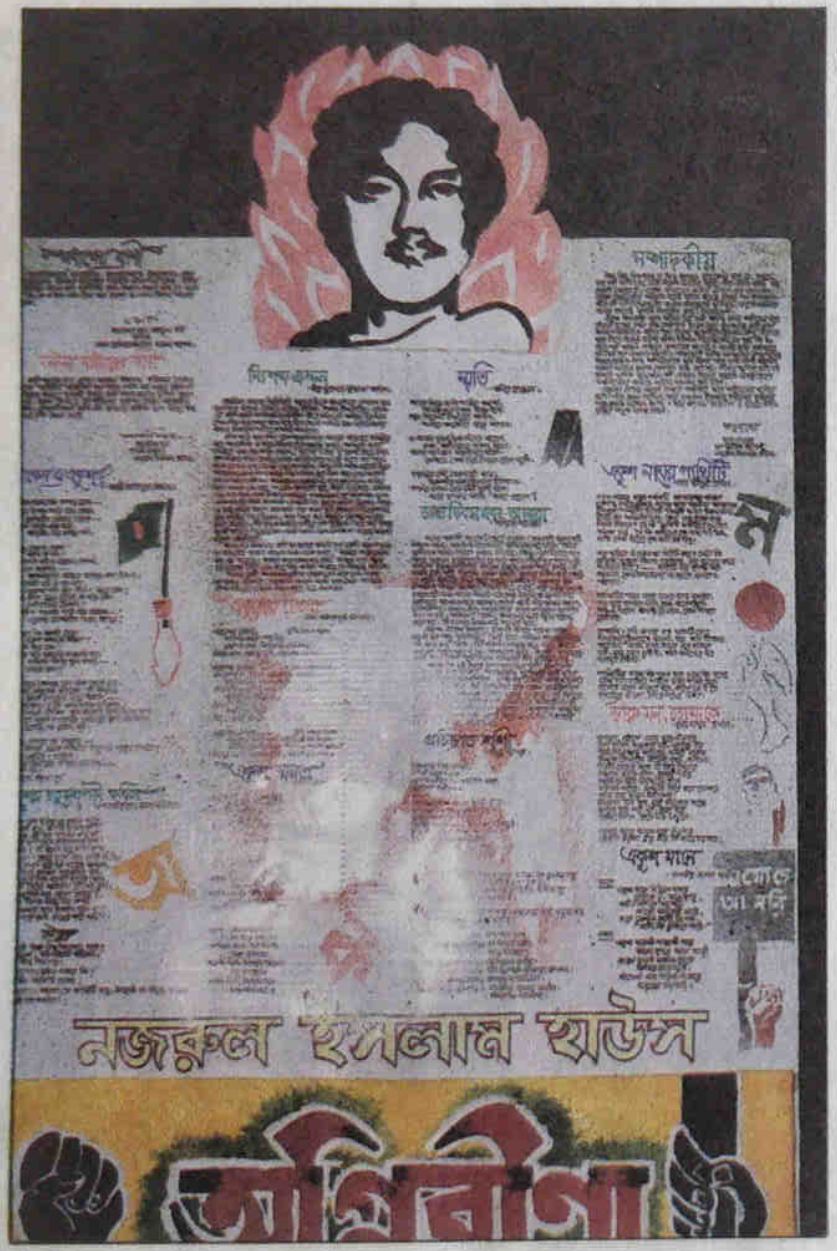

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ক্রীড়া
প্রতিমন্ত্রী সাদেক হোসেন

লালন শাহ হাউস

হাউস মাস্টার ঃ জনাব আব্দুল জব্বার
হাউস টিউটর ঃ জনাব শরীফ হারুণ-অর-রশীদ
হাউস এলডার ঃ মাস্টার ফয়সাল-আল-গফুর
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাস্টার মিজানুর রহমান

ছাত্রজীবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ছাত্রজীবনই জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। আর আমাদের কলেজের অধিকাংশ ছেলে তাদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিবাহিত করে কলেজের হাউসগুলোতে। কাজেই ছাত্রদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হাউসগুলোর দায়িত্ব বিশাল ও মহান। আমাদের কলেজের হাউসগুলো এই মহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। প্রত্যেক ছাত্রকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কলেজের হাউসগুলোর ভূমিকা অনবদ্য, অবিস্মরণীয়।

এ কলেজের সর্বশেষ সংযোজনরূপে আমাদের হাউসের উদ্ভব ঘটে ১৯৭৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ জনাব জিয়াউদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধানে। সে সময় এ হাউসটি ৩নং হাউস হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে প্রখ্যাত বাউল ও কবি লালন শাহ্-এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয় 'লালন শাহ হাউস'। এ মহান কবির উদার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তিবাদী মনোভাব, অকুণ্ঠ মানবপ্রীতি এ হাউসের প্রতিটি ছাত্রকে করেছে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত। তাদের চিন্তা চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে নতুন প্রাণের। তাই অত্যন্ত পারিবারিক পরিবেশে লালিত-পালিত এ হাউসের ছাত্ররা এক নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। জন্ম লগ্ন থেকেই লালন শাহ্ হাউস স্বীয় স্বাতন্ত্র ও কৃতিত্ব বজায় রেখে অন্যান্য হাউসের সাথে সমতালে এগিয়ে চলেছে।

এখানে মোট ৮টি সেকশনে ও ১০টি কামরায় ৯৫ জন ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু অনাবাসিক ছাত্রও এ হাউসের সাথে জড়িত রয়েছে। হাউসের নিয়ম-শৃংখলা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা, সকল বিষয়ে সকল ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করা ও হাউস পরিচালনা করার জন্য আমার সাথে রয়েছেন একজন সুযোগ্য হাউস টিউটর। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাউস আজ শ্রেষ্ঠত্বে আসনে আসীন। এছাড়া হাউসের কাজ-কর্ম তদারকের জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড।

এ হাউসের ছাত্ররা প্রতিদিনের সমস্ত কার্যাবলী নিষ্ঠার সাথে পালন করে। প্রাতঃকালীন শরীর চর্চার মাধ্যমে শুরু হয় সকাল। তারপর কলেজে যাওয়া বৈকালিক খেলাধুলা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করতে করতে অতিবাহিত হয় প্রতিটি দিন। ছাত্রদের বিনোদনের জন্য রয়েছে একটা কমনরুম ও একটা পাঠাগার। ধর্মীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রয়েছে একটি নামাজ ঘর। হাউসের প্রায় সব ছাত্র এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। হাউসের সামনে রয়েছে একটা সুন্দর ফুলের বাগান। হাজারো ফুলের রূপ-রস-বন-গন্ধে যখন হাউস প্রাঙ্গণ সুরভিত থাকে তখন পবিত্রতায় ভরে উঠে সবার মন। এভাবে এ হাউসে গড়ে উঠেছে একটি সুষ্ঠু আবাসিক ব্যবস্থা, মনোরম পারিবারিক পরিবেশ।

পড়াশুনার জন্য আমাদের হাউসে রয়েছে একটি সুন্দর পরিবেশ। আর তাই হাউসের ছাত্ররা বরাবরই কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। গত এস. এস. সি. পরীক্ষায় হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মোঃ মিজানুর রহমান সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২০তম স্থান অর্জন করেছে।

শুধু লেখা-পড়াতেই নয় খেলাধুলাতেও এ হাউসের ছাত্ররা পিছিয়ে নেই। খেলাধুলার জগতে

বিশেষ করে আন্তঃকক্ষ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্রদের কৃতিত্ব প্রশংসার দাবীদার। ১৯৯৩ সনে অনুষ্ঠিত আন্তঃকক্ষ ক্রীড়ায় লালন শাহ্ হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। টেবিল টেনিসে এ হাউসের ক্রীড়াবিদ উজ্জ্বল বিনীত বালা উইং বেল্ট হবার গৌরব অর্জন করে।

কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে লালন শাহ্ হাউস এক উজ্জ্বল নাম। সাংস্কৃতিক সপ্তাহ —'৯৩ তে লালন শাহ্ হাউস রানার আপ হয়। এছাড়া এই হাউসের ব্যতিক্রমধর্মী দেয়াল পত্রিকা 'দিশারী' শ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়াও এ হাউসের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে আযান, কিরাত, মিলাদ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

নেতৃত্বের ব্যাপারে লালন শাহ্ হাউসের ছাত্রদের অগ্রগামী ভূমিকা প্রতিবছরই কলেজের চত্বরকে প্রাণবন্ত করেছে। এ বছর এ হাউসের ছাত্র আমিরুল ইসলাম সুমন ক্যাপ্টেন হিসেবে, মোঃ মিজানুর রহমান ধর্মীয় প্রিফেক্ট হিসেবে ও পলাশ বসাক ম্যাগাজিন প্রিফেক্ট হিসেবে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শিক্ষকদের সহযোগি-তায় সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে।

এভাবেই নানা কৃতিত্বের মধ্য দিয়ে লালন শাহ্ হাউসের দৃপ্ত পদচারণা। এ কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে সকল আবাসিক-অনাবাসিক ছাত্র, সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা। মাননীয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর উৎসাহব্যাঞ্জক উপদেশবাণী এ হাউসের ছাত্রদের কর্মপ্রেরণার উৎস ও পথ নির্দেশক। করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা, এ হাউসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে তিনি সহায় হউন।

কলেজ সংবাদ

কেন্দ্রীয় মসজিদ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দেশের একটি অন্যতম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ অত্যাবশ্যক। কারণ সমজিদ না থাকলে এর অধিবাসীদের নামাজ আদায়ের জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে হত যা, এই প্রতিষ্ঠানের আবাসিক চরিত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ একটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কলেজের বোর্ড অব গভর্নর্সের ঊনপঞ্চাশতম সভায় মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং সেই সভায় এর অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী বোর্ড অব গভর্নর্সের সভায় মসজিদের নক্শা এবং প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদন লাভ করে। এরপর গত মাসে অত্যন্ত সীমিত সাধ্য নিয়ে, বড় আশায় বুক বেঁধে শুরু হয় এই মসজিদের নির্মাণ কাজ। ছাত্রদের সঞ্চিত টিফিনের অর্থ, পুরানো কাগজপত্র এবং পুরানো তৈজসপত্র বিক্রি করে যে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়, একত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ সেই মসজিদ আজ সমাপ্তির পথে! এ ব্যাপারে সকল মহলের অকুণ্ঠ সাহায্য আমরা পেয়েছি। তাদের সবাইকে জানাই আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা।

এই মসজিদ নির্মাণের একটি সুদূর প্রেক্ষাপট রয়েছে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মরহুম আব্দুল মোনায়েম খান একদিন আকস্মিকভাবে এই কলেজে আগমন করেন। এই কলেজের ছাত্ররা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। ছাত্রদের কোরআন তেলওয়াত ও কলেমা পাঠ শুনে তিনি এই কলেজের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং এই নির্মাণের জন্য ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার একটি চেক প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত অর্থ প্রায় ১,৮০,০০০/-(একলক্ষ আশি হাজার) টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মরহুম আব্দুল মোনায়েম খানই এই কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের প্রথম উদ্যোক্তা।

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস মসজিদ নির্মাণে অর্থ সংকটের কথা জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে একলক্ষ টাকা দান করেছেন। তাঁকে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

প্রাক্তন শিক্ষাসচিব ও এই কলেজের বোর্ড অব গভর্নর্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব শফিউল আলম ও তাঁর পরিবারবর্গের কাছ থেকে আমরা মসজিদ তহবিলে একলক্ষ টাকা চাঁদা পেয়েছি। তাঁদেরকে জানাই আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জনাব শফিউল আলম এই মসজিদের প্রথম উদ্যোক্তা প্রাক্তন গভর্নর জনাব আব্দুল মোনায়েম খানের জামাতা।

মসজিদ নির্মাণের এই মহৎ উদ্যোগে এই কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ চমৎকার ভূমিকা রেখেছেন। তারা একলক্ষ টাকা মসজিদ তহবিলে দান করেছেন।

অনেক মহানুভব অভিভাবক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের সাধ্য অনুযায়ী মসজিদ তহবিলে দান করেছেন। তাদের সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পরম করুণাময়ের কৃপায় অদূর ভবিষ্যতে প্রায় সাত হাজার স্কয়ারফিট বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হলে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী সহ এর তাব্য অধিবাসীগণ ক্যাম্পাসের ভেতরেই নামাজ আদায় করতে পারবেন।

মসজিদ তহবিলে যাঁরা এক হাজার টাকা বা তদূর্ধ অঙ্কের চাঁদা দান করেছেন তাঁদের একটি তালিকা দেয়া হল।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ তহবিলে চাঁদা দাতাগণের নাম।

ক্রমিক নং	নাম	চাঁদার পরিমাণ
১।	মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঃ ১,০০,০০০ (একলক্ষ টাকা)
২।	তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মরহুম আব্দুল মোনায়েম খাঁন ৫,০০০=১,৮০,০০০/-	ঃ ১,৮০,০০০ (একলক্ষ আশি হাজার টাকা)
৩।	মরহুম আব্দুল মোনায়েম খাঁনের পরিবারবর্গের পক্ষে মিসেস সুফিয়া আক্তার আলম	ঃ ১,০০,০০০ (একলক্ষ টাকা)
৪।	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	ঃ ১,০০,০০০ (একলক্ষ টাকা)
৫।	উম্মে সালমা চিশতী সহকারী অধ্যাপক	ঃ ১৫,০০০ (পনের হাজার টাকা)
৬।	জনাব শামসুল হক চিশতী বোর্ড অব গভর্নর্স-এর প্রাক্তন সদস্য	ঃ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা]
৭।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান (পাকিজা প্রিন্টিং)	ঃ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা)
৮।	জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী ও মরিয়ম চৌধুরী	ঃ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা)
৯।	তানজিম এহবাব (প্রাক্তন ছাত্র)	ঃ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা)
১০।	শেখ মোঃ ওমর আলী	ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা)
১১।	মিসেস রাহাতুননেছা হক	ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা)
১২।	জনাব আঃ মতিন সরকার	ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা)
১৩।	আলহাজ্জ এ্যাডভোকেট আমীর হোসেন	ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা)
১৪।	জনাব আলী মোহাম্মদ (প্রাক্তন ছাত্র)	ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা)

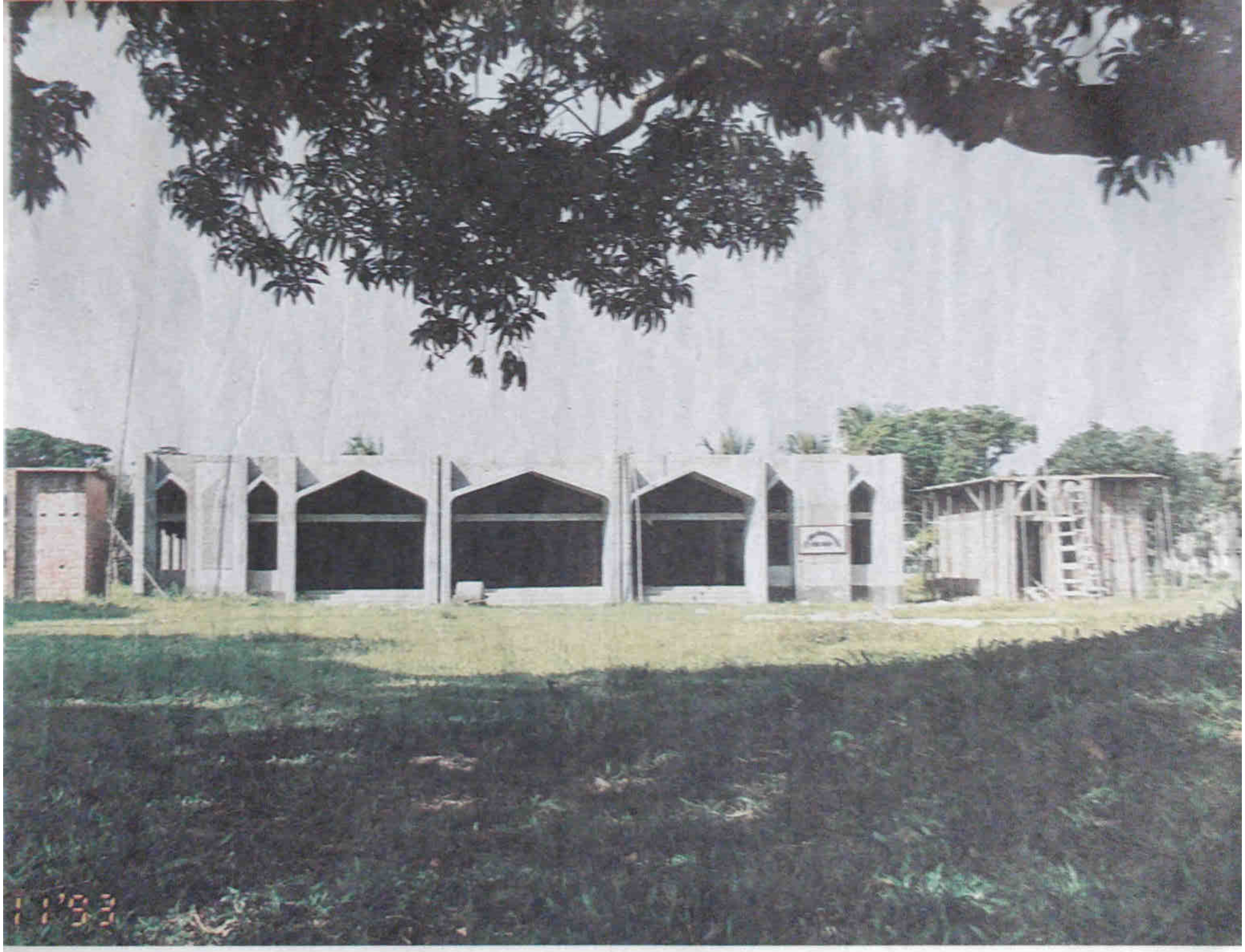

কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

ক্রমিক নং	নাম	চাঁদার পরিমাণ
১৫।	জনাব আবদুল্লা শিবলী	ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা)
১৬।	১৯৯৩ সালের একাদশ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার তহবিল থেকে প্রাপ্ত	ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা)
১৭।	১৯৯৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিকট হইতে কশানমানি ফেরতযোগ্য অর্থ	ঃ ৪৪,১০০ (চৌচল্লিশ হাজার একশত টাকা)
১৮।	মিসেস জাহান আরা ফরিদ	ঃ ৪,০০০ (চার হাজার টাকা)
১৯।	কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রবৃন্দ	ঃ ৭,০০০ (সাত হাজার টাকা)
২০।	জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্রবৃন্দ	ঃ ৬,১০০ (ছয় হাজার একশত টাকা)
২১।	নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রবৃন্দ	ঃ ৫,৬০৫ (পাঁচ হাজার ছয়শত পাঁচ টাকা)
২২।	নজরুল ইসলাম হাউসের প্রিফেকটরিয়াল বোর্ড	ঃ ১,৫৫০ (এক হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা)
২৩।	ফজলুল হক হাউসের ছাত্রবৃন্দ	ঃ ৫,১০০ (পাঁচ হাজার একশত টাকা)
২৪।	লালন শাহ্ হাউসের ছাত্রবৃন্দ	ঃ ৪,০০০ (চার হাজার টাকা)
২৫।	স্কাউট ছাত্রবৃন্দ	ঃ ৫,২৫৫ (পাঁচ হাজার দুইশত পঞ্চান্ন টাকা)
২৬।	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (এস ২০২ ৮ম শ্রেণী)	ঃ ৪,০০০ (চার হাজার টাকা)
২৭।	শাহারিয়ার ইমতেয়াজ (৫ম শ্রেণী, ৫৪৬০)	ঃ ৩,০০০ (তিন হাজার টাকা)
২৮।	মোঃ মনিরুল ইসলাম (৩য় শ্রেণী, ৬০৭৭)	ঃ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
২৯।	জনাব শামসুদ্দিন চৌধুরী (ফরিদপুর)	ঃ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩০।	জনার মোঃ রবিউল হক	ঃ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩১।	জনাব রেজওয়ান আলী	ঃ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩২।	রাজীব ও সজীবের আব্বা জনাব নূরুল আলম	ঃ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩৩।	জনাব আব্দুর রউফ সহযোগী অধ্যাপক	ঃ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩৪।	জনাব আঃ জব্বার প্রভাষক	ঃ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা)

ক্রমিক নং	নাম		চাঁদার পরিমাণ
৩৫।	জনাব নুরুল ইসলাম ভূঁইয়া	ঃ	২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩৬।	দেওয়ান সাদেকুর রহমান (একাদশ ৪০০১)	ঃ	২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩৭।	মিসেস সুলতানা আরজাল (সাকিল আহম্মদ এস-১০০)	ঃ	২,০০০ (দুই হাজার টাকা)
৩৮।	বেগম শামসুন নাহার হাই প্রযত্নে—অধ্যক্ষ, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৩৯।	ডাঃ খাদেমুল ইসলাম	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪০।	জনাব হারুন-উর-রশিদ	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪১।	জনাব জয়নুল আবেদীন	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪২।	জনাব আসমত আলী চৌধুরী	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪৩।	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪৪।	জনাব আমিনুল ইসলাম	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪৫।	জনাব মোঃ নুরুল হক ভূঁইয়া	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪৬।	জনাব মোঃ আমির হোসেন ভূঁইয়া	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৪৭।	জনাব এম এ গফুর	ঃ	১,০০১ (এক হাজার এক টাকা)
৪৮।	জনাব এস এম শরীফ হোসেন	ঃ	১,০০১ (এক হাজার এক টাকা)
৪৯।	জনাব ডাঃ মোঃ আঃ লতিফ	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫০।	জনাব মীর আজহার হোসেন	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫১।	জনাব মশিউজ্জামান বিশ্বাস	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫২।	জনাব উজ্জ্বল বিনীত বালা	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫৩।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫৪।	জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন শিকদার	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫৫।	জনাব এ কে এম ফজলুল হক	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫৬।	জনাব ফারহান জামান	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫৭।	জনাব মনিরুল ইসলাম	ঃ	১,০০৫ (এক হাজার পাঁচ টাকা)
৫৮।	জনাব কাজী কামরুজ্জামান (এস ৭৩, ৩য় শ্রেণী)	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৫৯।	জনাব ই এম এ ওসমান	ঃ	১,০০০ (এক হাজার টাকা)

ক্রমিক নং	নাম	চাঁদার পরিমাণ
৬০।	জনাব মোঃ আঃ কাইয়ুম	ঃ ১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৬১।	জনাব আকিব আফতাব (৬ষ্ঠ শ্রেণী, এস, ২৯৮)	ঃ ১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৬২।	জনাব ফারুক আহসান চৌধুরী (এস-১৫৬, ৭ম শ্রেণী)	ঃ ১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৬৩।	জনাব আমিনুর রশিদ	ঃ ১,০৩০ (এক হাজার ত্রিশ টাকা)
৬৪।	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য (মিসেস মামা চিং)	ঃ ১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৬৫।	রাবিশ (নজরুল হাউস) বিক্রি	ঃ ৩,০৪০ (তিন হাজার চল্লিশ টাকা)
৬৬।	জনাব ফকরুল আহসান চৌধুরী	ঃ ১,০০০ (এক হাজার টাকা)
৬৭।	কলেজের মধ্যে ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছ বিক্রি	ঃ ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত টাকা)
৬৮।	জি-টাইপ কোয়ার্টার গাছ বিক্রি	ঃ ২,৩২৫ (দুই হাজার তিনশত পঁচিশ টাকা)
৬৯।	মসজিদের সিডিউল বিক্রি	ঃ ৫,২৫০ (পাঁচ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা)
৭০।	পুরাতন বই-খাতা, হাড়ি-পাতিল বিক্রি (১১-৭-৯২)	ঃ ৮৭,৩০০ (সাতাশি হাজার তিনশত টাকা)
৭১।	পুকুর লিজ বাবদ	ঃ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা)
৭২।	পুরাতন বই-খাতা ও হাড়ি-পাতিল বিক্রি	ঃ ৭৫,২৪৯ (পঁচাত্তর হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ টাকা)
৭৩।	অত্র কলেজের প্রাক্তন কর্মচারী সি পি এফ তহবিল অবশিষ্ট অংশ	ঃ ১,২০,২২৬ (এক লক্ষ বিশ হাজার দুইশত ছাব্বিশ টাকা)
৭৪।	বিবিধ	ঃ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
৭৫।	অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ	ঃ ২২,৮২২ (বাইশ হাজার আটশত বাইশ টাকা)
	সর্বমোট	১১,০২,৪৫৯ টাকা

বিঃ দ্রঃ —স্থানাভাবে ১,০০০ (এক হাজার টাকা)-র নিচে যাঁরা মসজিদ তহবিলে দান করেছেন তাঁদের নাম এই তালিকায় উল্লেখ করা গেল না। তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় শিফট প্রবর্তন

বিগত কয়েক বছর ধরে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষ করে কয়েকটা নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ছাত্র-ভর্তি সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের এ কলেজে সমস্যাটি আরও বেশী তীব্র, আরও বেশী প্রকট, কারণ দু'টি—সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন এবং ছাত্রাবাসে নিরাপদ আবাসন। যা হোক, ভর্তি সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বিতীয় শিফ্‌ট প্রবর্তনের নীতি বাস্তবায়ন করেছে। সরকারের এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার এ কলেজে দ্বিতীয় শিফ্‌ট প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাইকে অতি স্বল্প সময়ে দ্বিতীয় শিফ্‌ট প্রবর্তনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। এরই ফলশ্রুতিতে গত ৩১শে মার্চ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে দ্বিতীয় শিফ্‌ট উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব এবং বোর্ড অব গভর্নর্সের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইরশাদুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাই। উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রদের প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার সদ্ব্যবহার করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

প্রাথমিকভাবে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশগুলোতে ৩২৯ জন ছাত্র নিয়ে ক্লাশ শুরু হলেও ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় শিফ্‌টে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ প্রবর্তনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় শিফ্‌টের শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি সম্পন্ন না হওয়ায় কলেজের অধ্যক্ষের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে প্রথম শিফ্‌টের উপাধ্যক্ষ (ভার-প্রাপ্ত), উপাধ্যক্ষ, জুনিয়র শাখা (ভারপ্রাপ্ত) এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বিতীয় শিফ্‌টের প্রথম পর্বের শিক্ষাদান কর্মসূচী পরিচালনা করেন। বর্তমানে প্রথম শিফ্‌টের ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব কাজী রেজাউল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় শিফ্‌টের ১২ জন এবং প্রথম শিফ্‌টের ৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বিতীয় শিফ্‌টের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় শিফ্‌ট প্রবর্তনের ফলে কলেজের আবাসিক বৈশিষ্ট্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে, বোর্ড অব গভর্নর্সের ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় শিফ্‌ট স্ব-অর্থায়িত ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

—০—

কৃতী ছাত্র

মিজানুর রহমান
কলেজ নং ৮৯৬
১৯৯৩ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০তম স্থান অধিকার করে।

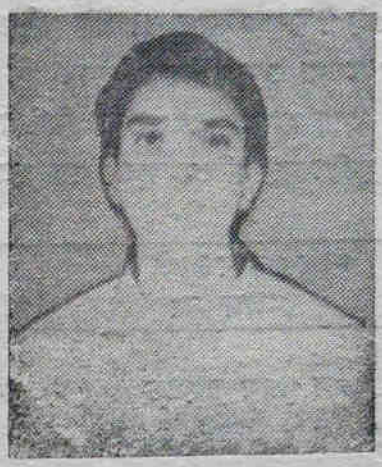

হোসেন ইস্‌রাত আদিব
কলেজ নং ৩৯১৮
১৯৯৩ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে ৮ম স্থান অধিকার করে।

নূরে আলম মিনা
কলেজ নং ৫৪১৩
১৯৯২ সালের উচচ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে ১৯তম স্থান অধিকার করে।

মোহাম্মদ জেহাদ উদ্দীন
কলেজ নং ৫৭২৪
১৯৯৩ সালের উচচ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে ১০ম স্থান অধিকার করে।

"পুঁথিগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন হলে প্রয়োজন"

এই উক্তি স্মরণ রেখেই জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে কলেজের ছাত্রদের মেধা ও কৃতিত্বের সুষম বিকাশের জন্য বহিরাঙ্গন প্রতিযোগিতায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সংক্ষেপে তাদের কৃতিত্বের পরিচয় তুলে ধরা হল।

ক্রমিক নং	ছাত্রের নাম শ্রেণী কলেজ নং	উদ্যোক্তা	প্রতিযোগিতার নাম ও বষয়	স্থান
১।	এ. এস. এম রহমত উল্লাহ একাদশ (বিজ্ঞান)	(ক) কমিটমেন্ট	জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশের উপর রচনা প্রতিযোগিতা	প্রথম
		(খ) কম্পিউটর জগৎ	কম্পিউটর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (গ গ্রুপ)	দ্বিতীয়
		(গ) বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস '৯৩ ও এফ. পি. এ.বি. এর ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (ইউ.এন.এফ. পি. এ ও এফ.পি. এ. বি.) ঢাকা জেলা পর্যায় (খ বিভাগ)	পোস্টার আঁকা প্রতিযোগিতা	তৃতীয়
		(ঘ) বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস '৯৩	সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা একক অভিনয় (গ গ্রুপ)	প্রথম
২।	আজগর আজিজ একাদশ (বিজ্ঞান) কলেজ নং—৩১৮৪	ঐ	ঐ	দ্বিতীয়
৩।	কামরুল আহমেদ একাদশ (বিজ্ঞান) কলেজ নং—৩৬৭৫	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস '৯৩ ও এফ. পি. এ.বি. র ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (ইউ. এন. এফ. পি. এ ও এফ. পি. এ. বি.) ঢাকা জেলা পর্যায় (ঘ বিভাগ)	পোস্টার আঁকা প্রতিযোগিতা	দ্বিতীয়

৪। পলাশ বসাক একাদশ (মানবিক) কলেজ নং—৫৯২৫	ঐ	ঐ	প্রথম
৫। সৈয়দ তানভীর রহমান একাদশ (বিজ্ঞান) কলেজ নং—৩৬৯৮	জাতীয় যাদুঘর আয়োজিত সেমিনার	বাংলাদেশের বাদ্যযন্ত্র	প্রথম
৬। আবু নাসের রাজীব একাদশ (মানবিক) কলেজ নং—৫৯৬২	ঐ	ঐ	দ্বিতীয়
৭। দেওয়ান সাইদুর রহমান একাদশ (বিজ্ঞান) কলেজ নং—৪০০১	ঐ	ঐ	তৃতীয়
৮। গোলাম কিবরিয়া জুয়েল ১০ম শ্রেণী (গ) বিজ্ঞান কলেজ নং—৪১৭৯	(ক) নবী দিবসের মেলা প্রতিযোগিতা '৯৩ ফুলকুঁড়ি আসর।	উপস্থিত বক্তৃতা	দ্বিতীয়
	(খ) নবী দিবস প্রতিযোগিতা '৯২ আবাবীল সংগঠন।	স্বরচিত ইসলামিক কবিতা	প্রথম
	(গ) আন্তর্জাতিক শিশু-কিশোর সেমিনার '৯৩ কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা।		
	(ঘ) বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার '৯২		প্রথম
	(ঙ) সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন		প্রথম
৯। গোলাম ইয়াহিয়া রুবেল ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৩৬৪	নবী দিবসের মেলা '৯৩ আবাবীল সংগঠন।	ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা "Great Muhammad (Sm.)	তৃতীয়
১০। মোঃ জহির উদ্দীন একাদশ (মানবিক) কলেজ নং—৫৯২৯	শিক্ষা সপ্তাহ '৯৩	ক্বেরাত	তৃতীয়
১১। মোঃ আরিফুল করিম ৭ম শ্রেণী (ক) কলেজ নং—৪৯৫১	বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র	বই পড়া	তৃতীয়
১২। ইশতিয়াক আবেদীন ৭ম শ্রেণী (ক) কলেজ নং—৫০৩৬	ঐ	ঐ	শুভেচ্ছা পুরস্কার
১৩। মোস্তফা ফারহান হক ৭ম শ্রেণী (ক) কলেজ নং—৪৯৪৭	ঐ	ঐ	দ্বিতীয়

১৪। মোঃ ইয়াসির আরাফাত ৭ম শ্রেণী কলেজ নং—৪৯২৮			অভিনন্দন পুরস্কার
১৫। সুলতান মাহমুদ ৭ম শ্রেণী, (ক) শাখা কলেজ নং—৪৯২৯			তৃতীয়
১৬। মোঃ মুর্তজা আহমেদ ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৯৪১		সামস ভাই কাবাডি	চ্যাম্পিয়ন দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়
১৭। ফুয়াদ হোসেন পঞ্চম শ্রেণী কলেজ নং—৫৮৬৪	কেন্দ্রীয় ফুলকুঁড়ি আসর '৯৩	সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা	তৃতীয়
১৮। হাফিজুর রহমান চতুর্থ শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৫৮৪৩	জাতীয় জাদুঘর	সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা	দ্বিতীয়
১৯। মোঃ গোলাম মুর্তজা ইকো, চতুর্থ শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৫৭৭১	ঐ	ঐ	সম্মান পুরস্কার (সাটি ক্রিকেট, ৬টি বই)
২০। মামুনুর রহমান ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৩৫০	বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র	বই পড়া প্রতিযোগিতা	তৃতীয়
২১। তানভির মাহমুদ ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৩৫১	ঐ	ঐ	তৃতীয়
২২। এস, এম মাহবুবুন্নবী ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৩৬১	ঐ	ঐ	তৃতীয়
২৩। গোলাম ইয়াহিয়া ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৩৬০	ঐ	ঐ	অভিনন্দন পুরস্কার
২৪। গোলাম মোস্তফা ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৯১৯	ঐ	ঐ	তৃতীয়
২৫। আশরাফুল ইসলাম ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৯২১	ঐ	ঐ	তৃতীয়
২৬। শরীফ আহমদ ৭ম শ্রেণীর (খ) কলেজ নং—৪৯৪৮	ঐ	ঐ	অভিনন্দন পুরস্কার

২৭। জহিরুল ইসলাম ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৯৭৩	বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র	বই পড়া প্রতিযোগিতা	তৃতীয়
২৮। সাইফুর রশিদ ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৩৭১	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন	গান	প্রথম
২৯। জহিরুল ইসলাম ৭ম শ্রেণী (খ) কলেজ নং—৪৯৭৩	(ক) জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র	চিত্রাঙ্কন '৯২	পঞ্চম
	(খ) সোভিয়েত কালচারাল সেন্টার।	চিত্রাঙ্কন '৯৩	দ্বিতীয়
	(গ) ছন্দা সাংস্কৃতিক স্বর্ণপদক	ঐ	প্রথম
	(ঘ) উত্তরাধিকার শিশু-কিশোর সাহিত্য।	সাংস্কৃতিক ও চিত্রাঙ্কন	দ্বিতীয়
	(ঙ) ইউনিভার্সিটি জুনিয়র চেম্বার।	চিত্রাঙ্কন '৯৩	তৃতীয়
	(চ) পূর্বিতা শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	চিত্রাঙ্কন	প্রথম
	(ছ) কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর	চিত্রাঙ্কন '৯৩	শ্রেষ্ঠ পুরস্কার
	(জ) জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা	শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	দ্বিতীয়

শোক সংবাদ

আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সোহেল সামাদ (৩৮) গত ১০ই আগস্ট, ১৯৯৩ ইং তারিখে ওয়াশিংটনের মেরিল্যাণ্ড হাসপাতালে ইন্তেকাল করে (ইন্নালিল্লাহে. . . . রাজিউন)। তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কলেজ প্রাঙ্গণে নেমে আসে শোকের ছায়া। তার অকাল মৃত্যুতে কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মর্মাহত। আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাচ্ছি। তার মৃত্যুতে কলেজ একজন প্রাক্তন কৃতি ছাত্রকে হারাল।

সোহেল সামাদ মেধাবী ছাত্র হিসেবে সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধ্যয়ন করে। সে এই কলেজে অধ্যয়নের সময় কলেজের কালচারাল প্রিফেক্ট ও কলেজ এ্যাল-ডারের দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে ঘোষকের দায়িত্ব পালন করে।

মৃত্যুর পূর্বে সে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সংবাদ পাঠক ছিল। ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে গত ১১ই জুন এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর সে মেরিল্যাণ্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।

ভয়েস অব আমেরিকায় যোগদানের পূর্বে সোহেল সামাদ রেডিও জার্মানীতে বাংলা অনুষ্ঠান প্রযোজনার দায়িত্বে ছিল। সে বাংলাদেশ টেলিভিশনেও একজন জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক ছিল।

ENGLISH SECTION

Love and Hatred

A. B. M. Shahidul Islam
Department of English

You know about so many things of different tastes, colours and interest around you. Do you know lies? Ofcourse you do, at least to some extent, since they are indivisibly interwoven with the affairs of our life just like the natural joys and sorrows, losses or gains are.

If you gather all the books of ethics and religions, and the speeches of all the saints, sages and scholars of great repute of all ages, you naturally get an unfathomable heap of advice and sermons against lies. If these advice, sermons and teachings were a nuclear bomb, its one single explosion aimed at pernicious lies, could wipe them out from the face of the earth. But such a longed for blast never took place and will never take place. So, lies, both black and white, with black seemingly predominating, had been there; are there, and will be there in the affairs of man.

People lies for a queer variety of reasons. Lies have many colours, faces and manifestation. They may be innocent, unharmfnl, heart touching and sometimes much needed. Again, they may be very vulgar, highly subtle, vicious, weird, nasty, heinous, torturing, devastating and disastrous. These black faced lies are at perpetual war against humanity from time unknown. We often listen to some lies smilingly and approvingly; to some smilingly but unwillngly; to some silently and helplessly; and to some compellingly but scornfully.

Think of M. K. Rawling's ***Jerry and his lies***. How innocent, unharmful and affecting these are! They add an extra dimension to his character, deepening the depth of his loneliness, intensifying the authentic cry of a starving soul, and making the irreparable wounds of his ever bleeding heart almost physically visible to us.

Think of Maugham's ***lady guest and her lies***. How feigning, cadish and torturing they are! They simply evoke our disgust and make her character—though memorable for many other reasons--a repelling stuff.

Think of the big bosses and their tricky and purposeful lies. Aren't they enormously harmful, keenly afflicting and far mor da-

maging than those of the commoners'? Infact, they are. Any explanation in this regard seems superfluous.

Think of a famous doctor treating a dying patient, and his lies. Aren't they sometime, if not always, enlivening and encouraging? Perhaps they are. Because thy have the power to add a consoling and comforting touch to the burning hearts of many; to save many a tear, atleast for the time being.

Think of a brilliant lawyer who knowingly takes side with a confirmed criminal, and his lies. How are they? Doesn't he trade lies for money? Doesn't he employ all his talents and efforts to see lies victorious? Doesn't he go all out to defeat his counterpart who fights for the right cause?

Think of the poets and their lies. I wonder if their fine, surprising and pleasing excess can at all be called lies. The sceptics may argue, but we should always know that poets' lies are ever encouraging, invigorating and inspiring and full of teachings.

Think of a callous and profit-monger businessman and his lies Aren't they patently vicious?

Now, think of a helpless and harpless mother trying to comfort her starving and crying child, and her lies. How are they? Aren't they heartrending? Don't they strike and prick our conscience?

Finally, think of the vile and servile politicians and tyrants, and their naked lies under the veil of sweet commitments. Aren't they extremely dangerous, devastating and disastrous? Don't they go directly and widely against the interest of humanity? Can this blame be adequately refuted? History will surely not help them.

Therefore, blatant lies and liars are always there, lying in wait to destroy our moral values and human qualities. So, knowing, distinguishing and marking things are very important for our own sake.

You can guard against your enemy only when you are able to detect them. Ignorance in this regard will leave you exposed and unprotected to the sheer advantage of your foes.

You are capable of fervent hatred for all that stain and ruin your soul, only when you are capable of deep love for all that elevate your status to the lofty rank of man a unique piece of creation— who is capable of loving, hating, accepting and refusing, but not giving in.

Humanity*

Md. Monirul Hoque
College No. 3044
An Ex-Student

My eyes run through
Horizon to horizon
My knowledge take closer look
Country to country,
My heart is burnt for
Days after days.
When I close my eyes
I can see the skeleton of
Somalia.
Oh! What a pain of starvation
Yes! Still now Hiroshima
radiating my mind
Hundred and hundred coffins in
Bosnia.
See! How much tears stored
in my heart
Shame! Millions of children decay
in morn
only for basic needs of
life-food, medicine & shelter.
Do you know—
Thousands of people
settlement destroyed
By natural calamities in Bangladesh.
Oh! How long this distressed
humanity last for!
Let us everyone pray to the lord
"May peace and humanity
prevail on earth forever"!

The Traffic Signal

Md. Shariful Islam
College No. 5529
Class V B

Stop, says the red light
Go, says the green,
Ready, says the yellow,
Ofcourse in between.
And that is known
And be obeyed by all
These are the rules of
The traffic signal.

The Cloudy Sky

Md. Aminul Islam
College No. 4401
Class VII A

The sky is cloudy
So it looks bad,
But when the farmers will see it
They will be glad.
If the fishermen see it
They will be sad,
God gives it and knows He best
If it is good or bad.

---

* The National Library of Poetry, Mary Land, has certifed Monirul Haque's poem HUMANITY as a semi-finalist in their 1993 North American Open Poetry Contest. It will automatically be entered into the final competition. Howard Ely, the managing Editor, writes in a letter to Monirul, "In view of your talent,also wish to publish your poem in our forth coming anthology A ***Break in the clouds*** (Library of Congress ISEN 1—5617-042-1)" It is ofcourse an honour for our country as well as for our college. Monirul Hoque appeared at the S. S. C. Examination, 1984 and H.S.C. Examination 1986 from our institution. Now he is doing his M. B. B. S. at Sir Salimullah Medical College. We all congratulate him on his success.

My life without you

Mahbooba Panna
Lecturer, English Deptt.

There will be no laughter,
no charm,
no pondering ; and
The repetition of those events wich,
I hate most.
There will be no
White Roses in my ; because
The bloom only to congratulate
My love for you.
The blue sky won't make any
effect on me
Though it taught me
To be broad minded and
To love you.
To love which is very divine
May be I will forget how much
I loved that blue sky
When I loved you.
Those green tress would be very
poor trees
The birds, those who usually
come to my garden
And I pass beautiful time talking
to them.
May be they won't talk to my
garden any more
For I won't talk to them.
I won't visit those places
Where we were together, very
close
I won't forget the smell of hair and
The smell I love most.
Sweet sensation.
How would I live with those
memories
Won't be I a different person
with different emotions ?

Three Boys

Kudrat-e-Khuda
Colle No. 5537
Class V B

The little one's name is Paul
He is good at his lesson all
The second boy's is Dale
He does not cut his nail.
The other boy's name is Peter
He loves singing with guiter.

The Little Boy Orland

Kazi Shahed
College No. 5197
Class VI B

There is a boy in Holland.
He was born in Poland.
His father works in Finland.
His mother is teacher in Newzeland.
He has travelled Auckland.
He is a cricketer of England.
His name is Orland.

কলেজ ভবন
COLLEGE BUILDING